১৭ এপ্রিল ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

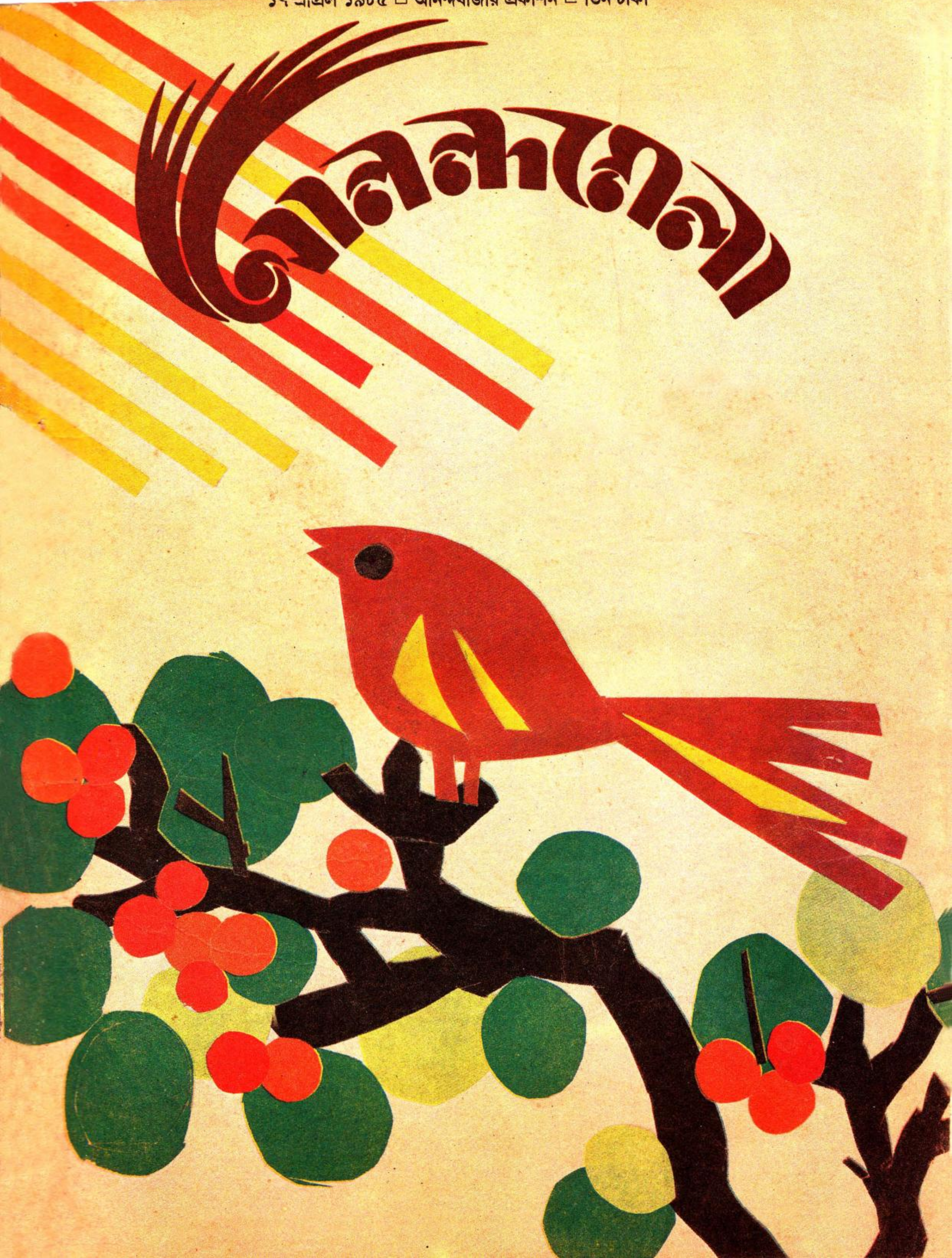

বেশী সুস্বাদু বেশী সম্পূর্ণ

**মায়ের মত মমতায় ভরা
প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর
বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।**

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।

এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো
একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই
শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দাঁত
ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে
আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/4/244 BEN

বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন ঃ
পোঃ বঃ নং **19119** বোম্বাই (FCM-3) **400 025**

আনন্দমেলা

৪ বৈশাখ ১৩৯২ □ ১৭ এপ্রিল ১৯৮৫ □ ১১ বর্ষ ১ সংখ্যা

গল্প
নীলবর্ণ বিড়াল । অনীশ দেব ৯
ঘড়িঘটিত ঘটনা । অশোক বসু ১৫
গলির গাওস্কর । অশোক রায় ২৯
ভুলের ফসল । প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
অনুবাদ-গল্প
কুমিরের বউ (ওড়িয়া গল্প) । মনোজ দাস ৪৫
বিশেষ রচনা
ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা । ভিক্ষু বুদ্ধদেব ৫
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৬
শার্লক হোমসের গল্প
নীলকান্তমণি-রহস্য । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৩
কবিতা ও ছড়া
বিরানব্বই । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯
সোমার টিফিন । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৫২
জ্যোতিষী মতি শী । শ্যামলকান্তি দাশ ৫২
রাজপুত্তুর । রাখাল বিশ্বাস ৫৫
সম্পূর্ণ উপন্যাসের শেষাংশ
ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত । শৈবাল মিত্র ৩৫
বিজ্ঞানবিচিত্রা
এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫১
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫১
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি (এবারে গল্প নয়) । প্রসাদ ৭
অর্থ জানো (নিশিত…খামখেয়াল) । দেব-সেনাপতি ৭
মালদহ জিলা স্কুল ২২
খেলাধুলো
বার্ধক্যের বারাণসী । রাজা গুপ্ত ৬২
দাত্তুর উইকেট পড়ে গেল । সম্রাট রায় ৬৩
ডেভিস কাপে ভারত । সুজয় সোম ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২১, টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ২৪
গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা ৩২, শব্দসন্ধান ৩২, মজার খেলা ৩৩
হাসিখুশি ৩৩, তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরায় ১০ পয়সা : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

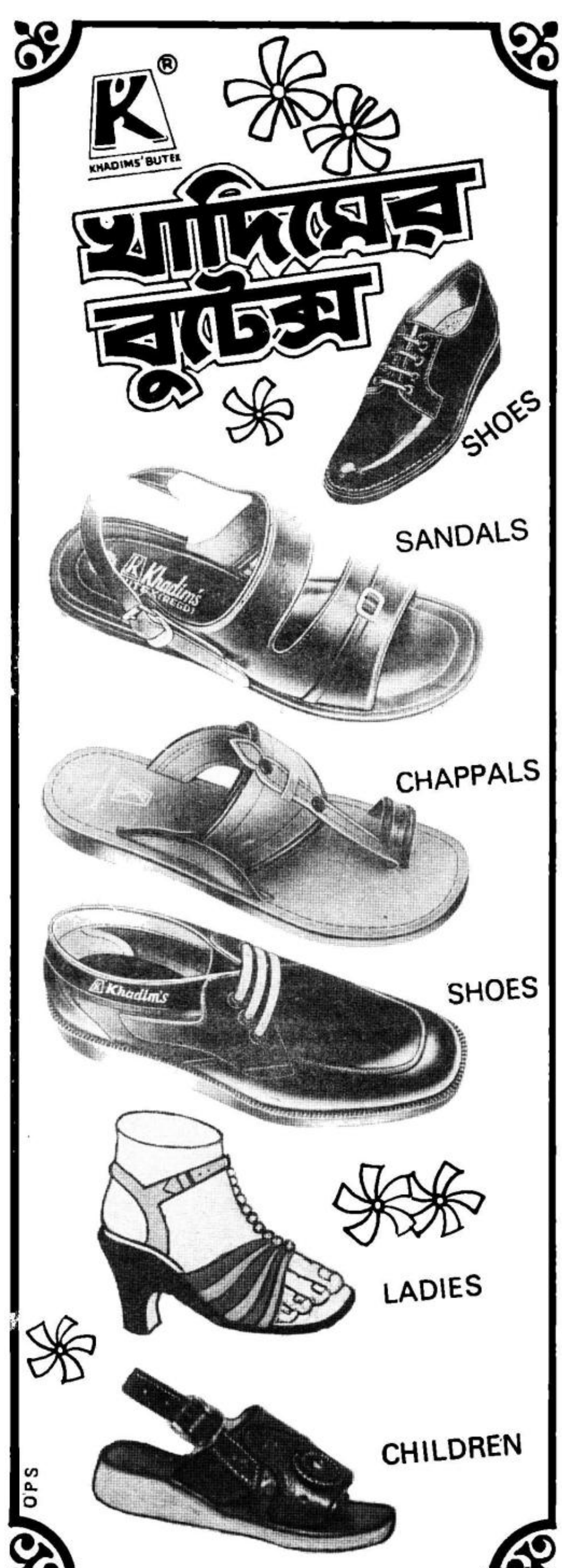

এবার আপনি কেয়ো-কার্পিন চুলে নতুন নতুন রূপে প্রতিদিন

আপনার চকচকে সুন্দর কেয়ো–কার্পিন চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না। চুল থাকে সুন্দর, পরিপাটি।

আধুনিক সাজে সাজতে হলে তাই আর তেলমাখা বন্ধ করতে হবে না। রোজ কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল মাখুন–চুল থাকবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধী। আর সপ্তাহের প্রতিদিন নতুন ধাঁচে চুল বেঁধে নতুনরূপে নিজেকে আবিষ্কার করুন।

কেয়ো-কার্পিন
সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-OMHO-2

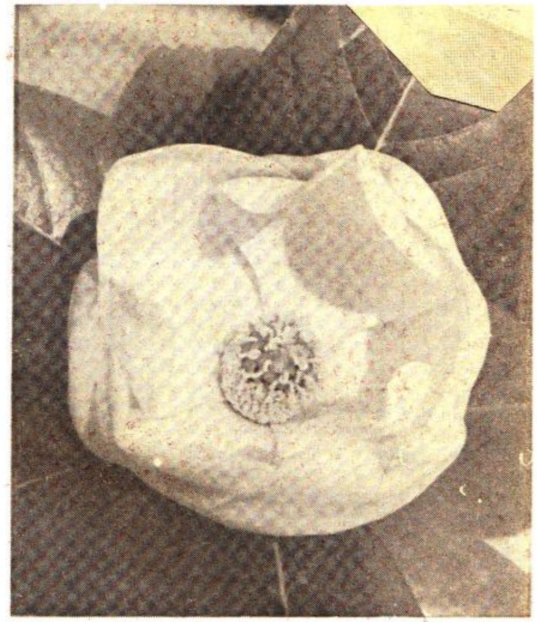

ম্যাগনোলিয়া গ্রান্‌ডিফ্লোরা

ভিক্ষু বুদ্ধদেব

আমার এক পরিচিত পুষ্পপ্রেমী তাঁর লেখা ফুলের বইতে লিখেছেন যে, তাঁকে যদি শুধু একটি ফুলগাছ বেছে নিতে বলা হয় তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ম্যাগনোলিয়া গ্রান্‌ডিফ্লোরাকে বেছে নেবেন। নানা দেশেই ম্যাগনোলিয়া গ্রান্‌ডিফ্লোরার সুনাম রয়েছে একটি খুব ভাল ফুলগাছ হিসেবে। 'গ্রান্‌ডিফ্লোরা'র অর্থ গ্রাণ্ড ফ্লাওয়ার, তবে বহু গাছের বেলাতে এ-শব্দটির ব্যবহার থাকলেও তাদের অনেকের ফুলই কিছু গ্রাণ্ড নয়। কিন্তু ম্যাগনোলিয়ার এই প্রজাতিটির বেলায় গ্রান্‌ডিফ্লোরা নামটি খুব খেটে গেছে।

গ্রান্‌ডিফ্লোরার ফুল টেনিস বলের মতো বড়, ফুলের রঙ দুধ-সাদা এবং ফুলে লেবুফুলের মতো গন্ধ রয়েছে। ফুল ফোটার সময় ফুলের ঠিক নীচে দিয়েই নতুন ডাল বার হয়; গ্রান্‌ডিফ্লোরার পাতা এমনিতেই দেখতে সুন্দর, নতুন পাতা দেখতে আরও ভাল। ফুলের নীচেই নতুন পাতা ফুলের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। গ্রান্‌ডিফ্লোরার ফুল ফোটে প্রধানত প্রথম গরম পড়ার সময়, কোনো-কোনো গাছে পরে আরও একবার ফুল দেয়।

গ্রান্‌ডিফ্লোরার চাষ বেশ সহজ, বড় গুল্ম বা ছোট গাছের মতো এর চাষ। দু-ভাগ বাগানের মাটি ও একভাগ গোবরসারের হারে এর সারমাটি তৈরি করবে, এবং এর জন্য গর্ত করবে পঞ্চাশ সেমি ব্যাস ও ষাট সেমি গভীর করে। এর ছোট গাছ ছোট টবে তৈরি অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। এই ছোট গাছ টব থেকে মাটিসুদ্ধ খুলে নিয়ে জমির গর্তের সারমাটিতে লাগাবে। গ্রান্‌ডিফ্লোরার চাষ টবে করতে যেও না, টবে এর ফুল ফোটানো মোটেই সহজ নয়।

গ্রান্‌ডিফ্লোরা একটু বড় হলে পুরো রোদ ভালই সহ্য করতে পারে, কিন্তু ছোট অবস্থায় এর কড়া রোদ না পেলেই ভাল। ছোট গাছ লাগানো ভাল বর্ষার প্রথমে অথবা শেষ-বর্ষায়। গাছের দ্বিতীয় বছর থেকেই তাকে কিছু বাড়তি গুঁড়োসার দেওয়া দরকার, এই সার শীত থাকতে থাকতেই দেওয়া হবে। গাছের বয়স বছর-পাঁচেক হলে তার থেকে নিয়মিত ফুল আশা করতে পারো। গরমের প্রথম থেকে বর্ষাকাল পর্যন্ত একে একটু বেশি করে জল দিতে হবে যাতে ফুলগুলি ভালভাবে ফুটতে পারে। এখানে গ্রান্‌ডিফ্লোরা গাছ কমবেশি সাত মিটারের মতো লম্বা হয়ে থাকে। এখানে সাধারণত গুটিকলমের সাহায্যে গ্রান্‌ডিফ্লোরার বংশবৃদ্ধি করা হয়।

ম্যাগনোলিয়া গোষ্ঠীর গাছের নাম উদ্ভিদবিজ্ঞানী ম্যাগনল-এর নামে। গ্রান্‌ডিফ্লোরা প্রজাতিটি আমেরিকার বনজ গাছ, এবং সেখানের বনে এখনও এ-গাছ ভিড় করে আছে। এই বনের গাছ সাধারণত আঠারো থেকে চব্বিশ মিটারের মতো লম্বা হয়ে থাকে, এবং আসবাব প্রভৃতি তৈরির কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম যে ম্যাগনোলিয়া গ্রান্‌ডিফ্লোরা গাছটি দেখি, সেটির ফুল ছিল অনেক ছোট কিন্তু তা ফুটত সংখ্যায় অনেক, পরে এই ধরনের গাছ আরও অনেক দেখেছি। ওই গাছটি দেখে ভাবতাম, এটা এমন কী আহামরি গাছ ; যে ফুলের বর্ণনা আগে দিয়েছি সে-রকম ফুলের গ্রান্‌ডিফ্লোরা পরে অনেক দেখেছি। এটাও পরে দেখেছি বা জেনেছি যে, গ্রান্‌ডিফ্লোরার ভেতরেও বেশ কিছু ধরনের গাছ রয়েছে। একটি বড় ফুলের গ্রান্‌ডিফ্লোরার গাছকে গরমের প্রথমে এবং আবার বর্ষাকালে—এই দু-দফায় ফুল দিতে দেখেছি—আমার দেখা গ্রান্‌ডিফ্লোরার ভেতরে এটিই সেরা।

ম্যাগনোলিয়া গ্রান্‌ডিফ্লোরার ফুল গাছে তো ভাল লাগেই, তবে তাকে আরও ভাল লাগে ফুলদানিতে। এই ফুল সকালে ফুটে সেই দিন বিকেলে শুকিয়ে যায়, পুষ্পসজ্জায়ও একে এই সময়ের জন্য ভাল ব্যবহার করতে পারবে। ফুলদানির গ্রান্‌ডিফ্লোরার সুগন্ধ সারা ঘর জুড়েই পাবে।

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে, আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।

জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই। আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়!

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু ...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

এবার গল্প নয়

আমাদের এই 'সহজে ইংরেজি'র আসরে আমরা ব্যাকরণ নিয়ে বড়-একটা মাথা ঘামাই না, তোমরা জানো। তার মানে, ব্যাকরণের বইয়ে যে-সব নিয়ম-কানুন লেখা থাকে, সে-দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে আমরা ইংরেজি পড়ে-পড়ে, আর যা পড়ছি তার মধ্যে ইংরেজি ভাষার রীতি-নীতি কী দেখতে পাচ্ছি সেইটে লক্ষ করে, ইংরেজি শিখবার চেষ্টা করি। আসলে, ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনও সেইভাবেই তৈরি হয়।

যেমন আমাদের এই বাংলা ভাষার কথাই ধরো না কেন। ধরো, বাংলা ক্রিয়াপদ 'যাওয়া'।

ব্যাকরণের বইয়ে লেখা আছে, এই ক্রিয়াপদটির অনেকগুলো রূপ : যাই, যাও, যায়, প্রভৃতি।

কখন এর কোন্ রূপটি লাগাতে হবে, তার নিয়মও ব্যাকরণে লেখা আছে। এখন, ধরো দু'জনে একটা কথোপকথন হচ্ছে :

খোকা, তুমি কি ইস্কুলে যাও ?
হ্যাঁ, আমি ইস্কুলে যাই।
তোমার ছোট বোনও ইস্কুলে যায় ?
হ্যাঁ, আমার ছোট বোনও যায়।
তুমি কাল ইস্কুলে গিয়েছিলে ?
হ্যাঁ, কাল গিয়েছিলাম।
আগামীকাল যাবে ?
হ্যাঁ, আগামীকালও যাব।
তোমার বোন কাল গিয়েছিল ?
হ্যাঁ, আমার বোনও গিয়েছিল।

সামান্য ইস্কুল যাওয়া নিয়ে এত জিজ্ঞাসাবাদ কেন জানি না, আমাদের জানবার দরকারও নেই। আমরা শুধু দেখছি 'যাওয়া' এই ক্রিয়াপদটা কত রকম চেহারা নিয়ে আসছে। তুমি যদি কোনও বাংলা ব্যাকরণের বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দ্যাখো তো দেখবে, ব্যাকরণের নিয়মমতো যখন যে রূপটির আসা দরকার, তখন সেইটেই আসছে :

আমি যাই, তুমি যাও, সে যায়
আমি যাব, তুমি যাবে, সে যাবে
আমি গিয়েছিলাম, তুমি গিয়েছিলে, সে গিয়েছিল।

অথচ যারা কথা বলছিল, তারা কিন্তু ব্যাকরণের বই পড়ে এ-নিয়ম শেখেনি। বরং, ঠিক তার উল্টো। লোকে বলে, আমি যাই, তুমি যাও, ইত্যাদি।

ইংরেজিতেও ঠিক তাই। ইংরেজরা বলে :

I go to school.
You go to school.
He goes to school.

ব্যাকরণের পণ্ডিতেরা তাই দেখে বললেন :

বর্তমানকাল একবচনে ওই ক্রিয়াপদটির রূপ হবে :
I go, you go, he goes.

পরের বার এই নিয়ে আরও বলব।

প্রসাদ

নিশিত…খামখেয়াল…

শব্দের সঙ্গে মশলার খুব মিল রয়েছে। রান্নায় যার পাকা হাত, সে ব্যঞ্জনে ঠিক কোন্ মশলা দিতে হবে তা জানে। কথা সুন্দর করতে হলে ঠিক কোন্ শব্দটি নেব তা আমাদের জানা দরকার। শব্দের অর্থও তাই শেখা দরকার। নীচের শব্দগুলি আমাদের খুবই পরিচিত, আর তা প্রায়ই ব্যবহার করি। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **নিশিত**—(ক) গভীর রাত্রি। (খ) মধ্যরাত্রি। (গ) তীব্র। (ঘ) শাণিত।

২। **ঘুণাক্ষরে**—(ক) কোনও ভাবে। (খ) আভাসে-ইঙ্গিতে। (গ) সম্পূর্ণ ভাবে। (ঘ) গোপনে।

৩। **পিলখানা**—(ক) ডাক্তারখানা। (খ) বন্দীশালা। (গ) হাতিশালা। (ঘ) বৈঠকখানা।

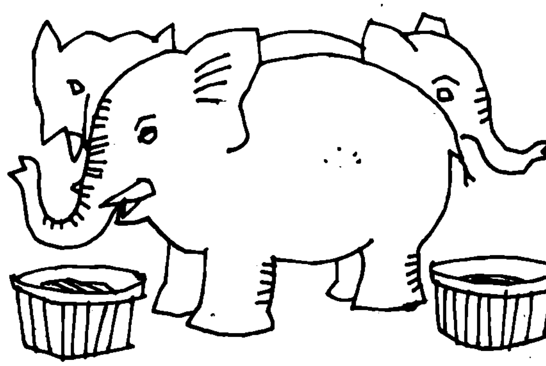

৪। **কুলজি**—(ক) কুলের যিনি শ্রেষ্ঠ। (খ) শ্রেষ্ঠ কুল। (গ) কোষ্ঠী। (ঘ) বংশতালিকা।

৫। **খামখেয়াল**—(ক) হঠাৎ খেয়াল। (খ) ছেলেমানুষি অসার খেয়াল। (গ) বাজে খেয়াল। (ঘ) অকারণ খেয়াল।

উত্তর : ১। **নিশিত**—(ঘ) শাণিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণধার। যেমন—নিশিত অস্ত্র।

২। **ঘুণাক্ষরে**—(খ) আভাসে-ইঙ্গিতে। ঘুণপোকা যখন কাঠ কাটে, তখন কাঠে কোনও কোনও অক্ষরের আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই থেকেই শব্দটির জন্ম। যেমন—এত বড় একটা ব্যাপার কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না।

৩। **পিলখানা**—(গ) হাতিশালা। ফার্সি পিল শব্দের অর্থ হাতি।

৪। **কুলজি**—(ঘ) বংশতালিকা অর্থাৎ বংশের পরিচয়। শব্দটি এসেছে কুলপঞ্জি থেকে। পঞ্জি বা পঞ্জিকা শব্দের একটি অর্থ বিবরণ।

৫। **খামখেয়াল**—(খ) ছেলেমানুষি অসার খেয়াল। ফার্সি খাম শব্দের অর্থ কাঁচা। যেমন—খামযুক্তি।

দেব-সেনাপতি

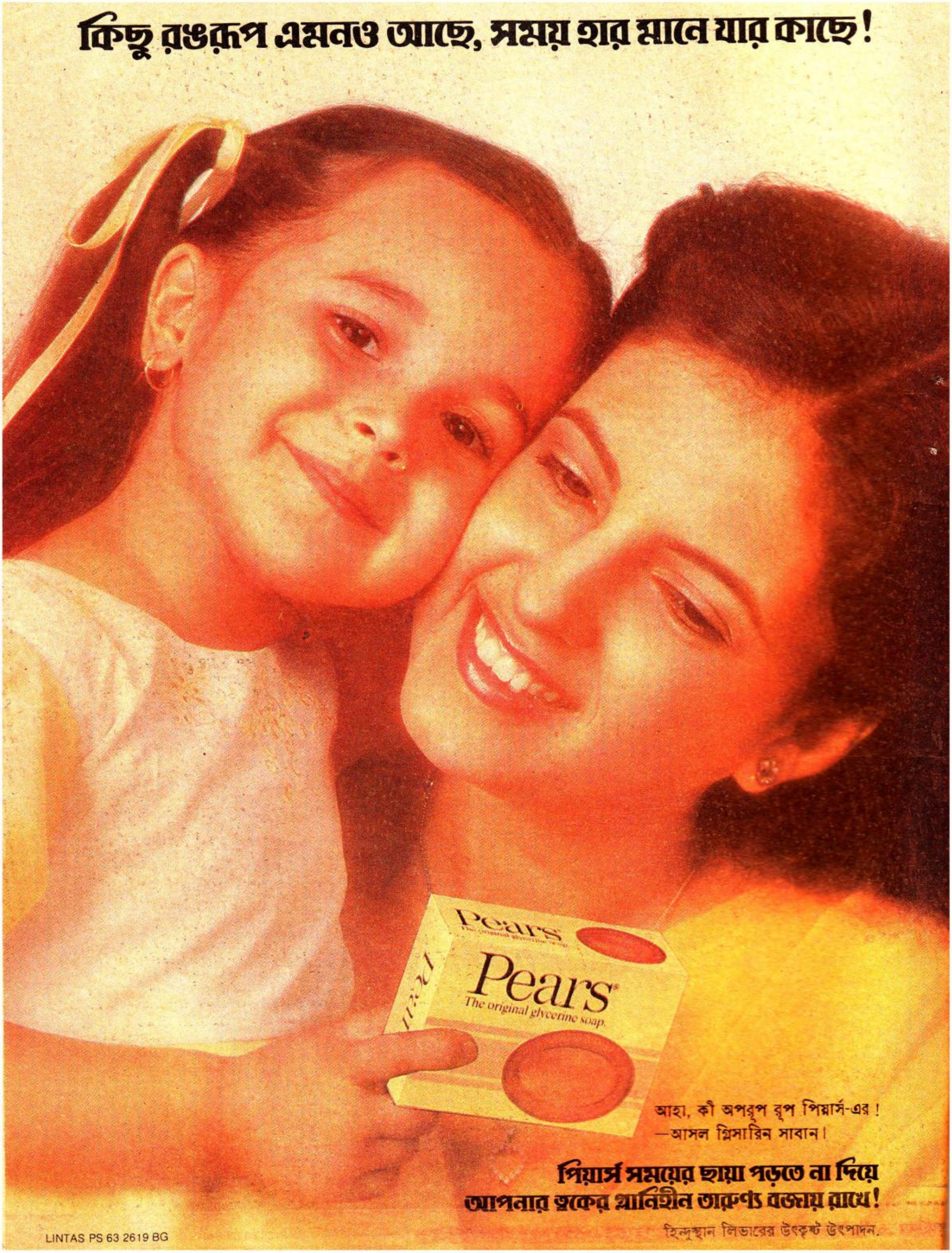
কিছু রঙরূপ এমনও আছে, সময় হার মানে যার কাছে!
Pears
The original glycerine soap.
আহা, কী অপরূপ রূপ পিয়ার্স-এর!
—আসল গ্লিসারিন সাবান।
পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে
আপনার ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে!
হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন.
LINTAS PS 63 2619 BG

নীলবর্ণ বিড়াল

অনীশ দেব

রাকেশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নীলবর্ণ শৃগালের স্বপ্ন দেখছিল । কাল রাতেই সদ্য-সদ্য গল্পটা পড়েছে ও । আচমকা নীলের গামলায় পড়ে গিয়ে নীল রঙের চেহারা হয়ে গিয়েছিল বেচারা শেয়ালটির । তারপর যখন সে জঙ্গলে ফিরে গেল তখন সমস্ত পশুপাখি তাকে জঙ্গলের রাজা বলে মেনে নিল । কারণ নীল রঙের শেয়াল তো তারা জীবনে কখনও দেখেনি । অতএব সেই অদ্ভুত রঙের প্রাণীটিকেই তারা সকলে মেনে নিয়েছিল বনের রাজা বলে ।

রাকেশ দেখছিল, একটা নীল রঙের শেয়াল ওকে এসে ডাকছে, "রাকেশবাবু, আমি কিন্তু গল্পের শেয়াল নই । সত্যিকারের নীল রঙের শেয়াল ।"

রাকেশ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি ?"

শেয়ালটা বলল, "সত্যি ।"

আর তারপরেই রাকেশকে হতভম্ব করে দিয়ে 'মিউ, মিউ' করে ডেকে উঠল ।

শেয়াল মিউ মিউ করে ডাকছে ! রাকেশ চমকে উঠল । আর তক্ষুনি ওর ঘুম ভেঙে গেল ।

ঘুম ভাঙতেই দেখল বিছানায় ওর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটা নীল রঙের বেড়াল । 'মিউ, মিউ' করে ডাকছে । কাচের গুলির মতো নীল চোখজোড়া জুল-জুল করে রাকেশেরই দিকে তাকিয়ে । সরু ঝাঁটার কাঠির মতো নীল রঙের গোঁফ । গায়ের রঙ গাঢ় নীল । শুধু লেজের ডগায় খানিকটা কালো ছোপ ।

রাকেশ ভাবল ওর স্বপ্নের ঘোর বোধহয় এখনও কাটেনি । চিমটি কেটে একবার দেখি তো ! যেমন ভাবা তেমনি কাজ । কিন্তু চিমটি কাটতে গিয়েই আবার অবাক । এ কী ! ওর ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ এরকম নীল হয়ে গেল কেমন করে !

একটা ব্রণ, তারপর আরও একটা, এমনি ভাবে ব্রণ বাড়তেই থাকে।
তাইতো আপনার দরকার বিশেষ ক্রিয়াযুক্ত উন্নত মানের ক্লিয়ারাসিল।

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল

অ্যান্টি-
ব্যাকটিরিয়াল
ট্রাইক্লোসানযুক্ত

যা, ব্রণ সাফ ক'রে দেয় আর তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে।

ব্রণ হ'ল বয়স বাড়ারই একটি অঙ্গবিশেষ। কৈশোরত্বে পা দেওয়ার পর কতবার ব্রণ বেরোতে থাকে, আবার মিলিয়ে যেতে থাকে—কিন্তু, ঐ ব্রণকে তখন অবহেলা করলে বা তার জন্যে শুধু বসে বসে চিন্তা করলেই তো আর কোনো সুরাহা হয়না, বা ওগুলি নখ দিয়ে টিপে দিয়েও দূর করা যায় না—তাতে শুধু জীবাণু আরও ছড়িয়ে পড়ে আর আরও ব্রণ বেরোতে সাহায্য করে।

ব্রণর সমস্যায় এই ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী কেন :

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল যে শুধু ব্রণ সাফই ক'রে দেয় তা নয়, তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে—কারণ, এতে যে থাকে একটি বিশেষ অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ওষুধযুক্ত ট্রাইক্লোসান। ট্রাইক্লোসানযুক্ত এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, জীবাণু থেকে হওয়া ব্রণকে বাড়তে দেয় না —আর, ত্বকের বাকী অংশগুলিও দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, আর তাই, ব্রণও আর বাড়তে পারে না।

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল থেকে কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়

প্রথমে মুখটি ধুয়ে নিন। তারপর এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান—আর, ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে লাগান। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল একনাগাড়ে কিছুকাল ধরে, সকাল ও রাত্রি, দিনে কমপক্ষে এই দুবার ক'রে লাগিয়ে যান।

ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন ক্লিয়ারাসিল তিন ভাবে কাজ করে

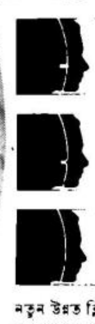

ব্রণকে খুলে দেয়
এর বিশেষ ওষুধ, ব্রণর মুখের ছাল ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে
নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল-এ আছে, এক অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসান। [illegible] এটি প্রতিরোধ করে।

ব্রণ শুকিয়ে দেয়
[illegible]

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল মুখের লোম কূপও নরম করে আলগা করে দিতে পারে।

এর সঙ্গে এও পাবেন ঃ
ক্লিয়ারাসিল ভ্যানিশিং মেডিকেশন

OBM/3556 BEN

তারপরই বাকি দুর্ঘটনাগুলো একে একে রাকেশের চোখে পড়ল।

ঘরের দেওয়াল, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল-চেয়ার, ফ্যান, ঘরের মেঝে—সর্বত্র শুধু নীল আর নীল! কোনোটার রঙ উজ্জ্বল নীল, কোনোটা ঘোলাটে নীল, কোনোটার রঙ কালচে নীল, আবার কোনোটা স্রেফ কুচকুচে কালো।

বিছানার বেড়ালটা তখনও 'মিউ, মিউ' করে ডেকে চলেছে।

রাকেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। পাশে মা নেই। অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। এখন নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। রাকেশের কান্না পেয়ে গেল। কোনোরকমে চিৎকার করে ও ডেকে উঠল, "মা, মা!"

মা ছুটে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

মাকে দেখে রাকেশের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল—কালচে নীল গায়ের রঙ। চোখের তারাটুকু শুধু কালো, বাকি অংশটা উজ্জ্বল নীল। ঝকঝকে দাঁতেরও একই দশা। অবশ্য মাথার চুলগুলো কুচকুচে কালো। যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

বিছানা থেকে নেমে এক ছুটে মা-কে গিয়ে জাপটে ধরল রাকেশ। শাড়ির ভাঁজে মুখ লুকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, "এ-সব কী কাণ্ড, মা? আমি কি ভুল দেখছি?"

মা ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, "না রে, তোর চোখের ভুল নয়, আমরা সব্বাই ওই নীল রঙেরই সব-কিছু দেখছি। সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি এই দশা। তবে ভয়ের কিছু নেই। একটু আগেই রেডিওতে আর টিভি-তে বলেছে, সারা পৃথিবী জুড়েই নাকি একই রকম কাণ্ড হয়েছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মায়ের কথায় রাকেশ বিশেষ ভরসা পেল বলে মনে হল না। ও বিছানায় বসা বেড়ালটাকে দেখিয়ে বলল, "ওই দ্যাখো—"

মা হাসলেন, বললেন, "ওটা তো তোর মিনু। রঙ পালটানোর ধাক্কায় ওর রঙও ওরকম নীল হয়ে গেছে। নে, এবার হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বোস্ দেখি—"

মাকে রোজকার মতো সহজ স্বাভাবিক দেখে রাকেশের বিস্ময় আর আতঙ্ক আস্তে আস্তে কাটতে লাগল। মা ব্যস্তভাবে রান্নাঘরে চলে যেতেই ও টুথব্রাশে খানিকটা টুথপেস্ট লাগিয়ে নিল। টুথব্রাশের রঙ এমনিতেই নীল ছিল। অতএব ওটার রঙে তেমন রদবদল হয়নি। কিন্তু সাদা টুথপেস্ট একেবারে গাঢ় নীল রঙের হয়ে গেছে।

মুখ ধুতে বেসিনের কাছে গিয়ে রাকেশ যথারীতি আবিষ্কার করল সাদা ওয়াশ-বেসিন ঘন নীল। এতক্ষণ ওর ভয়টা কেটে বেশ একটা মজা টগবগ করে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে ও এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল।

মা রান্না ছেড়ে টানা বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে পাশের বাড়ির টুকি-র মায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। হাসাহাসিও করছিলেন দুজনে।

রাকেশ শুনল, পাশের বাড়ির মাসিমা বলছেন, "দিদি, ভাতের আজ যা চেহারা হয়েছে, টুকির বাবা ভাত খেয়ে অফিস গেলে হয়।"

সত্যিই তো, নীল রঙের ভাত খাওয়া কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার! রাকেশ ভাবল।

মা তখন বলছেন, "আমারও তো একই অবস্থা, ভাই। ভাত, ডাল, হলুদ, লঙ্কা সব যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছে।"

টুকির মা-কে বেশ চিন্তিত মনে হল। উনি বললেন, "রাতারাতি এ কেমন ভোজবাজি হল বলুন তো, দিদি! আমার তো ব্যাপার-স্যাপার সুবিধের ঠেকছে না।"

মা বললেন, "একটু আগেই রেডিওতে বলেছে, বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। শিগগিরই এর সমাধান করে দিলেন বলে—"

রাকেশ আর দাঁড়াল না। ছুট-পায়ে চলে এল রাস্তার দিকের ঝুলবারান্দায়। ওমা! এ কী! আকাশে যে সূর্যটা উঠেছে সেটার রঙও যে ঘন নীল! আকাশের নীল রঙের সঙ্গে ওটা প্রায় মিশে গেছে। আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নীল রোদ্দুর। যে কটা গাছপালা দেখা গেল সবই নীল। শুধু কালো রঙের কাকগুলো নীলরঙা টিভি-অ্যানটেনার ওপরে বসে একই রকমভাবে 'কা-কা' করে ডাকছে।

রাকেশ মুগ্ধ চোখে চারদিকে দেখতে লাগল।

একটু পরেই মা বারান্দায় এসে হাজির। হাতে এক গ্লাস দুধ। ওকে ডেকে বললেন, "নে, রাকা, চটপট খেয়ে নে দেখি। উনুন জ্বলে যাচ্ছে।"

রাকেশ ব্যাজার মুখে দুধের গ্লাস হাতে নিল, নীল রঙের দুধ! মায়ের দিকে মুখ তুলে আবদারের গলায় বলল, "তুমিই বলো মা, এরকম দুধ কেউ খেতে পারে?"

মা ব্যস্তভাবে বললেন, "পারে, পারে, খুব পারে! যদি সব কিছুর রঙ এরকমটাই থেকে যায়, আর আগের মতো ফিরে না আসে, তাহলে অবস্থাটা কী হবে শুনি! নীল রঙের দুধ, ভাত, সবই তো খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, তাই না? মানুষ তো আর না খেয়ে থাকতে পারবে না! নে, তুই চটপট খেয়ে গ্লাসটা বেসিনের কাছে রেখে দিস, আমি যাই—"

মা ব্যস্ত পায়ে চলে যাচ্ছিলেন, রাকেশ জিজ্ঞেস করল, "বাবা এখনও আসেনি?"

মা বললেন, "উহুঁ। প্রায় এক ঘণ্টা তো হয়ে গেল বাজারে গেছে। মনে হয় বাজারে আজ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। নে, দুধটা জলদি খেয়ে নে—"

মা হুউশ্ করে চলে গেলেন।

রাকেশ অতি সাবধানে দুধের গ্লাসে একটা চুমুক দিল। মাগো! কী রকম গা গুলোচ্ছে। কিন্তু দুধের স্বাদটা একই রকম আছে। শুধু রঙ পালটে গেলেই খাওয়ার ইচ্ছেটা পালটে যায় কেন কে জানে! নইলে রাকেশ তো দুধ খেতে ভালই বাসে।

মিনু কখন যেন বিছানা ছেড়ে নেমে এসে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল আর ডাকছিল 'মিউ, মিউ' করে। বোধহয় দুধের গন্ধ পেয়েছে। ওকে খানিকটা দুধ দিয়েই দেখা যাক তো, খায় কি না। গ্লাস থেকে কিছুটা দুধ মেঝেতে ঢেলে দিল রাকেশ। ঠিক মিনুর সামনে। কিন্তু দেখল বেড়ালটা প্রথমে

কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

বাবার কাছেই রাকেশ শুনেছে কুকুর, বেড়াল,গোরু,মানুষের মতো বর্ণালির সাত রঙ দেখতে পায় না। এমনকী লাল কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে স্পেনে যে ষাঁড়ের লড়াই হয় সেখানে ষাঁড় মোটেই লাল কাপড় দেখে খেপে ওঠে না। সে বেচারা কাপড়টাকে দেখে গাঢ় ছাই রঙের। আসলে কাপড়ের টুকরোটার দ্রুত নড়চড়াতেই সে খেপে উঠে ওটাকে তাড়া করে।

সুতরাং হিসেবমতো মিনুও নিশ্চয়ই দুধটাকে এখন কালো রঙের দেখছে। কারণ ওর পক্ষে তো আর নীল রঙ দেখা সম্ভব নয়। হয়তো সেই জন্যেই ও দুধটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

অবশেষে ঘ্রাণশক্তিরই জিত হল। গন্ধে গন্ধে জিভ বাড়িয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা দুধের স্বাদ নিল মিনু। তারপর 'চক-চক' শব্দে গোটা দুধটাই চেটেপুটে সাফ।

মিনুর দেখাদেখি চোখ বুজে অতি কষ্টে গ্লাসের দুধ শেষ করল রাকেশ। তারপর একটু জল খেয়ে গ্লাস মায়ের কাছে রেখে এসে পড়ার বই নিয়ে বসল।

ইতিহাস বই খুলেই রাকেশ বুঝল পড়াশোনা করা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ বইয়ের গাঢ় নীল রঙের পৃষ্ঠায় খুদে খুদে কালো অক্ষরগুলো ভাল করে দেখতে পাওয়াই মুশকিল। রাকেশ মনমরা হয়ে প্রত্যেকটা বই আর খাতার পৃষ্ঠা উলটে উলটে দেখতে লাগল। দূর ছাই, স্কুলে গিয়ে তাহলে আর কী হবে! বই ছেড়ে উঠে বাবার টেবিল থেকে ট্রানজিস্টার রেডিওটা নিয়ে এল ও। সুইচ অন্ করে নব ঘুরিয়ে কান পাতল। সঙ্গে-সঙ্গেই শুনতে পেল বিশেষ ঘোষণা: "...সেই কারণেই সব কিছু বিবেচনা করে রঙের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এই আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে দ্রুত গবেষণা করছেন এবং স্বাভাবিক পবিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার জন্য সরকার অনুরোধ জানিয়েছেন ..."

সুইচ টিপে রেডিও অফ্ করে দিল রাকেশ। সামান্য রঙের রকমফেরের জন্য এ কী কাণ্ড হল!

এমন সময় ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। রাকেশকে বললেন, "রাকা, তোমার ইস্কুল ছুটি।"

রাকেশ দেখল, বাবার পরনে নীল আদ্দির কাপড়ের পাঞ্জাবি, নীল ধুতি। গায়ের রঙ কালচে-নীল।

পাঞ্জাবি খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে বাবা আবার বললেন, "বাজারে তো একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড। অদ্ভুত-অদ্ভুত রঙের সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে: নীল ফুলকপি, নীল রজনীগন্ধা, আর মাছের বাজারে কালো-কালো পোনা মাছের টুকরো।"

"কেন, কালো রঙের কেন?" রাকেশ জানতে চাইল।

বাবা হেসে বললেন, "হবে না? রক্তের রঙই যে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে! এছাড়া বাজারে শুনলাম, গাড়ি-ঘোড়া, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সব নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। এইমাত্র রেডিওতে বলেছে।"

"কই দেখি, রেডিওটা দে তো—"

রাকেশ রেডিওটা বাবাকে দিল। তারপর বইপত্র গুছিয়ে রেখে আবার ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

উলটোদিকের বাড়ির ছাদে তিনটে গাঢ় নীল রঙের পায়রা বসে ছিল। ও-বাড়ির তপনদা পায়রা পোষে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রাকেশ ভাবছিল। সত্যি, কী অদ্ভুত ব্যাপার। সূর্যের সাত রঙের ছ-ছটা রঙ উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য কী বিপত্তি। সারা পৃথিবীর জীবনযাত্রা একেবারে অচল। রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোও বিপজ্জনক। চারদিকে শুধু নীল রঙ

অথবা কালো রঙ। আর তা নইলে তাদের কমবেশি মিশেল দিয়ে তৈরি কোনো নীলচে রঙ। এই ধরনের পরিবেশে গাড়ি চালাতে গিয়ে অভ্যেস না থাকায় ড্রাইভাররা হয়তো অ্যাক্সিডেন্টই করে বসবে। সেই জন্যেই যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে রেডিওতে।

সিনেমা হলগুলোও বন্ধ থাকবে নিশ্চয়ই। নীল ছাড়া বাকি সব রঙ উধাও হয়ে গেলে রঙিন ছবির আর বাকি থাকল কী! আবার সাদা-কালো সিনেমাতেও একই বিপদ! সাদা রঙ বলে কিছু থাকবে না। তার বদলে থাকবে শুধু নীল আর নীল! ঠিক টিভির মতোই দশা!

যতদিন রঙগুলো ছিল ততদিন বোঝা যায়নি সেগুলো কত জরুরি। বোঝা যায়নি সেগুলো না থাকলে লাগাতার বন্ধ শুরু হয়ে যাবে মানুষের জীবনে। এখন দিনগুলো কাটবে কেমন করে সেই নিয়েই রাকেশের চিন্তা।

বিকেলবেলায় বাবার কাছে শুনল কলকাতার সমস্ত রঙ কোম্পানি নতুন কোনো ব্যবসা খোলার কথা ভাবছে। নানান দোকানে তাদের যত রঙ ছিল সব ভোল পালটে নীল অথবা কালো হয়ে গেছে। এদিকে বুড়ো মানুষদের চুলদাড়ি সব নীল হয়ে গিয়ে তাদের ভারী চমৎকার লাগছে। সেই দেখে কালো চুল যাতে তাড়াতাড়ি পেকে গিয়ে নীল হয়ে যায় তার জন্যে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সেলুনে কালো চুল নীল করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

রাকেশ অবাক হয়ে বাবার কথা শুনছিল। এমন সময় রেডিওতে বলল: এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হিমালয়ের বরফে ঢাকা চুড়ো আকাশের নীল রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় মোট সাতাশটি এরোপ্লেন এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় আছড়ে পড়েছে। ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা এই রঙ বদলের ঘটনায় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

এরকম চমকে দেওয়া আরও কত সব দুর্ঘটনা!

রাকেশের খুব মন খারাপ লাগছিল। ও পায়ে-পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সন্ধে হয়ে ঘন আঁধার নেমে এসেছে। কিন্তু আকাশে চাঁদ-তারা কই? গাঢ় পিচ-রঙ আকাশে ঘোর নীল রঙের চাঁদ। ভাল করে ঠাহর করা যায় না। আর তারা? চোখে প্রায় পড়ে না বললেই চলে। ইশ্, এরকমভাবেই কাটবে প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত!

রাকেশ ঘরে ফিরে এল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। নিয়ন লাইট আর বাল্‌ব। দুটোর অবস্থাই একরকম। বাবা-মা চুপচাপ বসে। মায়ের মুখে সকালের ঠাট্টার লেশমাত্র নেই এখন। বাবাও যেন বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মুখ গম্ভীর। রেডিও সামনে নিয়ে বসে আছেন। রেডিও ছাড়া আর উপায় কী! গল্পের বই পড়া বন্ধ। খবরের কাগজ পড়া বন্ধ। টিভি দেখা বন্ধ। ঘরে বসে বসে সকলেই বোধহয় এইরকম হাঁপিয়ে উঠছে।

রেডিওতে গানের অনুষ্ঠান শুনছিলেন বাবা। হঠাৎই রাকেশের দিকে ফিরে বললেন, "রাকা, খেয়াল করছিস, যারা খবর পড়ে শোনাচ্ছে তাদের মাঝে-মধ্যে কী রকম আটকে যাচ্ছে! নীল কাগজে কালো লেখা পড়তে গিয়ে খবর-পড়ুয়ারা একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।"

রাকেশ সামান্য হাসল।

মা বললেন, "তবু রেডিও ছাড়া আর উপায় কী বলো—"

রাকেশ জিজ্ঞেস করল, "খবরে কিছু বলেছে, বাবা?"

"হ্যাঁ, বলেছে, মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন, সূর্যের মধ্যে কোনো-একটা গোলমালের জন্যেই এরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে তাঁরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।"

মিনু রাকেশের পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। রাকেশ ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর একটা কালো বল নিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে শুরু করল। সময় যেন আর কাটতেই

চাইছে না।

এমনি করেই একসময় রাত দশটা বাজল। কোনোরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাকেশ মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল। মিনুও শুয়ে পড়ল ওর কোল ঘেঁষে। বাবা পাশের ঘরে যাবার সময় বলে গেলেন : "রাকা, মন খারাপ করিস না। কাল সকালে উঠেই দেখবি স-ব ঠিক হয়ে গেছে।"

বাবার কথাটা যে এরকম হাতেনাতে ফলে যাবে সেটা রাকেশ কল্পনাও করতে পারেনি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই ও অবাক। ধবধবে সাদা মিনু মিঁউ, মিঁউ করছে কালকের মতোই। চোখের ভুল নয়তো? রাকেশ শুয়ে-শুয়েই দেখল চারপাশে। ঘরের দেওয়াল আবার সাদা হয়ে গেছে, ফর্সা হয়ে গেছে ওর গায়ের রঙ, জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে সোনা রঙের ঝকঝকে রোদ। পাশে তাকিয়ে দেখল, মা নেই। আগেই উঠে পড়েছেন।

রাকেশ লাফিয়ে উঠে বসল। মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল ওর। যাক, সব কিছু আবার তাহলে আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেছে! কিন্তু হল কেমন করে?

রাকেশ বিছানা ছেড়ে ছুটল রান্নাঘরের দিকে—মায়ের সন্ধানে।

সেখানে পৌঁছে দেখে বাবা হাত-পা নেড়ে মাকে কী সব যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। এক হাতে বাজারের দুটো থলে। থলেদুটো উঁচু করে বাবা মাকে বলছেন, "এই দ্যাখো, ধরো এটা হলো সূর্য। সূর্য থেকেই তো সাদা আলো আসছে আমাদের পৃথিবীতে—"

মা বাধা দিলেন, "সাদা আলো কোথায়, ও তো হলদে আলো!"

বাবা একটা অদ্ভুত শব্দ করে ধৈর্য হারালেন। তারপর বললেন, "দূর ছাই! তোমাকে বলে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং রাকাকে বলি—"

রাকেশ খুশি-খুশি মেজাজে বলে উঠল, "সব রঙ আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে, বাবা। কিন্তু ও-রকম ওলট-পালট হয়েছিল কেমন করে? রেডিওতে কিছু বলেছে?"

"আরে সেটাই তো তোর মাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। রেডিওতে সংক্ষেপে যা বলল, তা হল এই : গত পরশু রাতে—অর্থাৎ, ধরে নে, তিরিশ ঘণ্টা আগে, সূর্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কী কারণে এই বিস্ফোরণ তা এখনও বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বলছেন, সেই বিস্ফোরণের ফলে সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিচিত্র এক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। সেই বিকিরণ সূর্যের সাদা আলো থেকে ছ-ছটা রঙ একেবারে শুষে নিয়েছিল। তারা শুধু গেট-পাস দিয়েছিল নীল রঙটাকে। ফলে সব জিনিসকেই নীল রঙের দেখাচ্ছিল। তাছাড়া ঐ বিকিরণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যের সবচেয়ে কাছের তিনটে গ্রহ—বুধ, শুক্র আর পৃথিবীতে। সেইজন্যে আমাদের এখানকার কৃত্রিম আলোগুলোও—মানে নিয়ন লাইট, বাল্ব সব—নীল রঙের আলো ছড়াচ্ছিল ...।"

"কিন্তু কালো রঙটা?" ভাতের হাঁড়িতে হাতা নাড়তে নাড়তে মা প্রশ্ন করলেন।

তার জবাব দিল রাকেশ, "কালোটা কোনো রঙ নয়, মা। বরং কোনো রঙ না থাকলে সেই জিনিসটাকে আমরা কালো দেখি।"

মায়ের মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল রাকেশের ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপূত হয়নি। সেটা অনুমান করে বাবা বললেন, "যাই হোক, ভারতীয় সময় অনুযায়ী গতকাল রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ সূর্যকে ঘিরে-থাকা ওই বিচিত্র বিকিরণ মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। ফলে বর্ণালির বাকি ছটা রঙ আজ সকাল থেকেই আবার ফিরে পাওয়া গেছে। আর পৃথিবীর ওপর থেকেও কেটে গেছে ওই বিকিরণের প্রভাব। সুতরাং রাতের আলোয় আর কোনো গোলমাল থাকবে না। সিনেমা টিভিও দেখা যাবে আগের মতোই।

বাবা বাজারের থলে দুটো বগলদাবা করে রাকেশকে লক্ষ করে গলা নামিয়ে বললেন, "রাকা, এবারে রঙের ব্যাপারটা ছোট্ট করে তোর মাকে বুঝিয়ে দিই, কী বলিস?"

রাকেশ মজা পেয়ে ঘাড় কাত করল। মা রান্নায় মগ্ন হলেও এদিকে যে কান পেতে আছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

গলাখাঁকারি দিয়ে বাবা বলতে শুরু করলেন, "শোনো, সূর্যের যে সাদা আলো—মানে, তোমার মতে হলদে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে ওটাই সাদা আলো—ওই সাদা আলো ভাঙলে দেখা যাবে ওর ভেতরে সাতটা রঙ মিশে আছে। আকাশে রামধনু উঠলে বর্ণালির সেই সাতটা রঙ আমরা আলাদা করে দেখতে পাই। দিনের বেলা সব জিনিসের ওপরেই সাদা আলো পড়ে, কিন্তু তবুও বিভিন্ন জিনিসকে আমরা বিভিন্ন রঙের দেখি। এরকমটা কেন হয়? ধরো, এই যে তুমি লাল রঙের শাড়ি পরে আছ, এই শাড়িটাকে লাল দেখানোর কারণ এটা বর্ণালির লাল রঙ ছাড়া আর সব কটা রঙই শুষে নিয়েছে। শুধু গেট-পাস দিয়েছে লাল রঙটাকে। যেমন ওই বিকিরণ নীল রঙটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। যে জিনিস সব রঙ শুষে নেয় তাকে আমরা কালো দেখি। আর যে জিনিস বর্ণালির সব কটা রঙকেই ফিরিয়ে দেয়—মানে, ছেড়ে দেয়—তাকে আমরা দেখি সাদা রঙের। যেমন, আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবি, বা হাঁড়ির ওই ভাত। ব্যস, এবার তো বুঝলে।"

মা হাতা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ঢের বুঝেছি! এখন চটপট বাজারটা করে আনো দেখি। কাল তো নীল-ভাত খেতেই পারোনি, আজ ভাল করে দুটো সাদা ভাত খেয়ে অফিসে যেও।"

বাবা চলে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, "কাল খবরের কাগজ পড়তে পারিনি। আজ দেখি কোনো টেলিগ্রাম বেরোল কি না—"

মা রাকেশকে লক্ষ করে বললেন, "কী হল, রাকা, যাও, পড়তে বোসো গিয়ে—"

রাকেশ পড়ার টেবিলে ফিরে এল। মিনু টেবিলের নীচে চুপটি করে বসে। জানলা দিয়ে বাইরের রোদ দেখতে ওর খুব ভাল লাগছিল। ও উঠে গিয়ে গরাদে মুখ ঠেকিয়ে চোখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। আজ সূর্যটাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে! কই, এতদিন তো এরকম মনে হয়নি! বরং সূর্যটা যেন সকলের কাছে বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছিল। অথচ আজ একেবারে ঝকঝকে নতুন!

ছবি : দেবাশিস দেব

ঘড়িটা শেষপর্যন্ত কোথায় পাওয়া গেল?

ঘড়িঘটিত ঘটনা

অশোক বসু

মুখের মধ্যে নিয়ে কী যেন খাচ্ছিল মৌ। টিপু তেরছা চোখে মৌয়ের দিকে একবার তাকিয়েই নিজের কাজে মন দিল। গতকাল পিণ্টুদের বাড়ির সামনের রাস্তায় একটা বোতাম কুড়িয়ে পেয়েছে সে। সেই বোতামের সঙ্গে পরশু রাতে পিণ্টুদের বাড়ির দুঃসাহসিক চুরির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখছিল। ছোটকাকার কাছ থেকে অনেক বলে-কয়ে যে ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা ম্যানেজ করেছিল, তাতে চোখ রেখে বিভিন্ন কোণ থেকে বোতামটা দেখছিল।

মৌ বলল, "কী দেখছিস রে দাদা, পিঁপড়ে?"

মেঝে দিয়ে পিঁপড়ে যাচ্ছে সেটাই দেখল মৌ, কিন্তু মেঝেতে যে একটা জলজ্যান্ত বোতামও আছে, সেটা তার চোখে পড়ল না। টিপু গম্ভীর মুখ করে বলল, "চুরি করে আচার খাওয়াটা ভীষণ অপরাধ।"

মৌয়ের মুখের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। অবাক হয়ে গেছে সে। বয়ামে তাড়াতাড়ি হাত ঢোকাতে যাওয়ায় তার হাতের চারপাশে আচার লেগে গেছে, আর তাই দেখে যে টিপু কথাটা বলেছে, তা তো আর সে জানে না। মা জানতে পারলে ভীষণ বকবে। টিপুর গা ঘেঁষে বসে খোশামুদে গলায় মৌ বলল, "দাদা, তুই কিন্তু বড় হলে মস্ত ডিটেটেকিভ হবি।"

টিপু অমনি খুশি হয়ে গেল। বলল, "দূর বোকা, ডিটেটেকিভ নয়, ডিটেকটিভ। বুঝলি মৌ, আমি তখন তোকে আমার অ্যাসিসটেণ্ট করে নেব। ওয়াটসন কিংবা তোপ্‌সের মতো।"

"ধ্যাত। তা কেমন করে হবে! আমি তো মেয়ে।"

"মেয়ে হয়েছিস তো কী হয়েছে! মিস মার্‌প্‌ল কি মেয়ে নয়?" ক্লাস এইটে পড়লে কী হবে, টিপু এর মধ্যে শরদিন্দু, সত্যজিৎ রায়, নামকরা ইংরিজি বইয়ের বাংলা অনুবাদও ছোটকাকার কাছ থেকে নিয়ে পড়ে ফেলেছে। বোতামটা হাতে নিয়ে বলল, "এটা কী বল তো?"

মৌ বোতামটা ভাল করে দেখে বলল, "বোতামের মতো দেখতে একটা জিনিস।"

"বোতামের মতো দেখতে নয়, বোতামই। এই রহস্যজনক বোতামটা কাল পিণ্টুদের বাড়ির সামনে পেয়েছি। এর মধ্যে পরশু রাতে ওদের বাড়িতে যে চুরি করেছে, সেই চোরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।"

মৌ একটু ঝুঁকে বলল, "কই? কিচ্ছু তো দেখা যাচ্ছে না।"

"দূর বুদ্ধু, সত্যিই কি তাই! এই কালো বোতামটা দেখে চোরটার একটা বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। সে কালো প্যাণ্ট পরে এসেছিল। বোতামটা অনেক দিনের পুরনো বলে প্যাণ্টটাও অনেকদিনের পুরনো। তা ছাড়া আজকাল প্যাণ্টে বোতাম থাকে না। চেন, হুক, এই সব থাকে। লোকটা খুব অন্যমনস্ক, সব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা তার স্বভাব। তার কোমরের বোতামটা যে আলগা হয়ে গেছে, খেয়ালই করেনি। আর তাড়াহুড়ো করার জন্যেই বোতামটা খুলে পড়ে গেছে। লোকটা গ্রামে থাকে। শহরের লোক এ-রকম সেকেলে প্যাণ্ট পরে না। লোকটা চোর। অন্য লোকের বোতাম হলে সে কুড়িয়ে নিত। চোরকে পালাতে হয়েছিল বলে এটা কুড়িয়ে নেবার সময় পায়নি।"

কিন্তু এ-রকম চুলচেরা বিশ্লেষণেও মৌ খুব অবাক

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে
এসেছেন যার ··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন
মমতার পরশ ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বরষিত হয়
আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে
গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন
অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J&J 23 2619 BG

হয়ে গেল না। বলল, "তোর কথাটা একটু-একটু সত্যিও হতে পারে।"

'একটু-একটু সত্যি' কথাটা শুনে টিপুর রাগ হয়ে গেল, "তুই কিন্তু আচার চুরি করে খেয়েছিস?"

মৌ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "তোর কথাগুলো একদম সত্যি রে দাদা।"

ঠিক তখনই ছোটকাকা ঘরে ঢুকল। টিপুর হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই, তোর হাতে ওটা কী রে?"

মৌ বলল, "চোরের বোতাম ছোটকাকা।"

"কই দেখি?" বলেই বোতামটা হাতে নিয়ে ছোটকাকা বলল, "কেমন করে জানলি এটা চোরের বোতাম?"

মৌ বলল, "দাদা ডিটেকটিভ করে বুঝতে পেরেছে।"

ছোটকাকা হাহা করে হেসে উঠল, "ডিটেকটিভ হওয়া কি এতই সোজা? টিপুর মতো সাধারণ মাথায় হয় না, ও'সবে এলেম লাগে। আসলে ওটা দারোগার বোতাম। না দেখেই আমি বলতে পারি। এসব হচ্ছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আর নিখুঁত বিশ্লেষণীশক্তির ব্যাপার। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড, হাঁদারাম?"

ছোটকাকা নিজেই নিজেকে মস্তবড় গোয়েন্দা-প্রতিভা ভাবে। টিপুকে পাত্তাই দেয় না। টিপুর সব ব্যাপারই হেসে উড়িয়ে দেয়। ছোটকাকা চলে যাবার পর টিপু কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর একটা পুরনো স্কুল-সুটকেসে তার গোয়েন্দাগিরির সরঞ্জাম—ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, মোমবাতির টুকরো, ব্লেড, কাঁচি, নোটবই, গুলতি, ভাঙা কাঁচ, পেপার কাটিং—এইসব পুরতে-পুরতে বলল, "আমার ভিউ-ফাইণ্ডারটা তোকে দিয়ে দেব মৌ।"

মৌ অমনি লাফিয়ে উঠে বলল, "এই দাদা, সত্যি কি না বল না?"

টিপু বলল, "এমনি-এমনি দেব না। একটা কাজ করে দিলে তবে দেব। শুধু ভিউ-ফাইণ্ডার নয়, আমার নতুন পেইন্টিং-বক্সটাও দেব।"

ঝলমল মুখে মৌ বলল, "ছোটকাকাটা কিচ্ছু জানে না, তাই না রে দাদা?"

পরদিন রবিবার। একটু বেলায় স্নান করতে যাবার আগে ঘড়ি দেখতে গিয়ে ছোটকাকা সেটা ড্রয়ারে দেখল না। প্রথমে ভাবল, হয়তো অন্য কোথাও আছে। কিন্তু সব সম্ভাব্য জায়গায় খুঁজেও ঘড়িটা পাওয়া গেল না। নতুন ঘড়ি। সবে চাকরিতে ঢুকে প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই কিনেছিল। ঘড়িটা না পেয়ে ছোটকাকা হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল।

বাবা বললেন, "কোথায় মনের ভুলে রেখেছিস। ঠিক পাওয়া যাবে।"

ছোটকাকা বলল, "সকালেই তো ড্রয়ারে ছিল। বাংলা-নিউজের সময় আমি চাবিও দিয়েছি। ঘড়ি আমার চুরি হয়েছে। আমি পুলিশে খবর দেব।"

বাবা বললেন, "দিনের বেলায় চোর কেমন করে আসবে? দ্যাখ, কেউ নিয়েছে কি না।"

কিন্তু দেখা গেল কেউ ঘড়িটা নেয়নি। এবার বাবাও অবাক হয়ে গেলেন। সত্যিই তো আর ঘড়িটার হাত-পা নেই যে, নিজের থেকে চলে যাবে। কিন্তু কেই বা ঘড়িটা নেবে। বাড়ির পুরনো চাকর রামু। ভাবাই যায় না। বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, "তাই তো! ঘড়িটা গেল কোথায়!"

ছোটকাকার স্নান-খাওয়া মাথায় উঠল। নিজের গোয়েন্দা বুদ্ধিতে ভেবেচিন্তে একবার চেষ্টা করল নিরুদ্দেশ ঘড়িটার কোনো সুলুক-সন্ধান পাওয়া যায় কি না। একটু পরেই হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "না, থানায়ই খবর দিতে হচ্ছে।"

ছোটকাকা সত্যিই হয়তো থানায় খবর দেবে না, ওটা রাগের কথা। কিন্তু তাই বলে ঘড়িটা পাওয়াই যাবে না, এই বা কেমন কথা। সবাই মিলে আরও কিছুক্ষণ ছোটকাকার ঘরে জোর তল্লাশি চালাল, কিন্তু কিছুতেই ঘড়িটা পাওয়া গেল না। ছোটকাকা রাগ করে বলল, "ও ঘড়ি নেই।"

মা তখন ঘরে কী করছিলেন, মৌ চুপিচুপি মা'র কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "মা, ঘড়িটা না পাওয়া গেলে কী হবে?"

মা বললেন, "খুব খারাপ হবে। বাড়ি থেকে ঘড়িটা উধাও হয়ে যাবে, এটা খুব ভাল কথা নয়।"

"কেউ যদি এমনি-এমনি বুকশেলফের মধ্যে লুকিয়ে রাখে?"

মা মৌয়ের মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, "তা হলে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

"কোথায় ধরে নিয়ে যাবে মা?" মৌয়ের মুখ তখন সাদা হয়ে গেছে।

সন্দিগ্ধ-চোখে মৌয়ের মুখ দেখতে-দেখতে মা বললেন, "কোথায় আবার, জেলখানায় ধরে নিয়ে যাবে। সেখানে সারাজীবন একটা অন্ধকার ঘরে তালাবন্ধ করে আটকে রাখবে। হাজার কান্নাকাটি করলেও কেউ শুনবে না।"

মৌয়ের মুখে ভয়ের ছায়া ভাসল। কিছু না বলে একছুটে সে ঘর থেকে পালাল। মা'ও সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

টিপু এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। সবার আড়ালে আড়ালে ছিল। একটু পরে সবাই যখন টিপুদের ঘরে বসে ঘড়িটার কথা ফের আলোচনা করছে, তখন সে হঠাৎ বলল, "খুনও নয়, ডাকাতিও নয়, ব্যাঙ্ক লুঠও নয়, সামান্য একটা ঘড়ি। একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পাওয়া যাবে। এতক্ষণ জিনিসটা নিয়ে ভাবিনি, তাই পাওয়া যায়নি।"

টিপুর মুখে পাকা-পাকা কথা শুনে ছোটকাকা আড়চোখে একবার তাকাল। কিছু বলল না। ঠোঁটের কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি ভেসে রইল শুধু। মা কিন্তু মুখ টিপে হাসছেন। বাবা বললেন, "বেশ তো, বুদ্ধি খরচ করে বের করে ফেল দেখি।"

টিপু গম্ভীর মুখের ভাব করে একটু সময় ভাবল। তারপর বলল, "ছোটকাকা আর বাড়ির অন্যান্যদের মুখে যতটুকু শোনা গেছে, তাতে বোঝা যায়, ঘড়িটা চুরিও হয়নি, হারিয়েও যায়নি। আমার ধারণা, ঘড়ি স্রেফ ভুলোমনের শিকার হয়ে গেছে।"

ছোটকাকা ঠাট্টা করে বলল, "একেবারে ছাপা অক্ষরের শার্লক হোমস।"

মা হাসতে হাসতে বললেন, "আহা, বলুক না। দেখাই যাক না কী করে।"

টিপু ছোটকাকার কথায় কান না দিয়ে বলল, "ঘটনাটা আবার মনে করা যাক। সকালে ছোটকাকা ঘরে বসে বই

ত্বকে এক জ্যোতি জাগায়–
রেক্সোনা
REXONA
Rexona
FOR SOFT AND GLOWING SKIN
জ্যোতির্ময় ত্বক······এক এমন ত্বক, যার
স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর,
আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !
রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক
তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ),
লবঙ্গ আর টৌরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের
যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।
রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।
LINTAS RX 84 2416 BG

পড়ছে, রেডিওতে বাংলা সংবাদ শুরু হল। সাতটা পঁচিশ। ছোটকাকা বই হাতে উঠে সময় মেলাল, ঘড়িতে চাবি দিল। ঠিক তখনই হঠাৎ রাস্তায় খুব গোলমালের শব্দ শোনা গেল। কী হয়েছে দেখতে ছোটকাকা তাড়াতাড়ি বইটা শেল্‌ফে রেখে জামা গায়ে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ঘটনাগুলো পরস্পর যুক্ত। রাস্তার গোলমাল, শেল্‌ফে বই রাখা, জামা গায়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা, এই ঘটনাগুলো অতি দ্রুত পরপর ঘটে গিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে গেছে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে বইটা যেখানে আছে, ঘড়িটাও সেখানে থাকবার কথা।"

"বললেই হল?" ছোটকাকা লাফ মেরে উঠে সোজা নিচের ঘরে চলে গিয়ে বুকশেল্‌ফটা একটু খুঁজতেই অবাক কাণ্ড। ঘড়িটা সত্যিই সেখানে আছে। ছোটকাকা ভয়ানক অবাক হয়ে গিয়ে বলল, "তার মানে?"

টিপু বলল, "এসব হচ্ছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আর নিখুঁত বিশ্লেষণী-শক্তির ব্যাপার।"

ছোটকাকা কটমট চোখ করে টিপুর দিকে তাকাল। বাবা বললেন, "শাবাশ টিপু! তোর হবে।"

মৌ কিন্তু ব্যাপারটা দেখে দারুণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। ঘড়িটা আবার বুকশেল্‌ফে কেমন করে এল, সে বুঝতেই পারছিল না। পুলিশের কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে সে ঘড়িটা তো শেল্‌ফের বইয়ের পেছন থেকে নিয়ে আবার ছোটকাকার টেবিলের ড্রয়ারেই রেখে দিয়েছিল। সেটা আবার শেল্‌ফের সেই জায়গাতেই কেমন করে গেল, সেটা সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

একটু পরে টিপু যখন বারান্দায় একা, তখন মৌ আস্তে আস্তে টিপুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "এই দাদা, ভিউ-ফাইণ্ডারটা দিবি বলেছিলিস।"

টিপু বলল, "ভ্যাট। তুই একটা রামভিতু। পুলিশের নাম শুনেই ভয় পেয়ে গিয়ে ঘড়িটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলি। কিন্তু মা আরও মজা করার জন্যে সেটা আবার শেল্‌ফে রেখে দিয়েছিল বলেই তো ব্যাপারটা গুবলেট হয়ে গেল না।"

মৌ ভয়ানক অবাক হয়ে গিয়ে বলল, "তুই দেখেছিস?"

"ধ্যুত,ছোটকাকার ঘরেই ঢুকিনি,দেখব কেমন করে? আমি সত্যি-সত্যিই গোয়েন্দাগিরি করেছিলাম, বুঝলি। আমি দেখলাম তুই মাকে ভয়ে-ভয়ে কী যেন বললি। বলেই চুপিচুপি ছোটকাকার ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এলি। ছোটকাকা তখন ঘরে ছিল না। বুঝলাম, ঘাবড়ে গিয়ে তুই ঘড়িটাকে ফের ড্রয়ারে রেখে এসেছিস। একটু পরেই মা'ও ছোটকাকার ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল। মা'র মুখে মজা করার হাসি দেখে সন্দেহ হল, তোকে ঠকানোর জন্যে মা নিশ্চয় ঘড়িটা আবার শেল্‌ফে রেখে দিয়েছে। অবশ্যি একটু আন্দাজে ঢিলটা ছুঁড়লেও সেটা ঠিক লেগে গেল।"

মুখখানা মেঘলা করে মৌ বলল, "কালার-বক্সটাও দিবি না?"

টিপু বলল, "ওটা দিতে পারি। কিন্তু ছোটকাকাকে কোনোদিন যদি বলে দিস তো ফের কেড়ে নেব।"

ছবি: জয়ন্ত ঘোষ

বিরানব্বই

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইংরেজি নববর্ষে তোমার
পুরনো ক্লাসের সব বই
বাতিল হয়েছে। শোনো এইবার
বাংলার বিরানব্বই
নাকচ করবে কাকে, বলি তাই,
বাতিল করবে কাকে সে,
বাজাবে সে কার জন্যে সানাই,
সাড়া দেবে কার ডাকে সে।

নাকচ করবে আলস্য আর
জীর্ণ মনের জড়তা,
বাতিল করবে সর্ব আঁধার,
সকল স্বার্থপরতা।
সে বলে, "তোমারই মালা-চন্দন
আমরা রেখেছি সাজিয়ে,
এসো হে নবীন, এসো হে নূতন,
ঝড়ের ডঙ্কা বাজিয়ে।"

ছবি: অনুপ রায়

আচ্ছা, কাচবার পর আপনার কাপড় জামা ঠিক ধবধবে সাদা হয় কি?

"আমি তো সেরা ডিটারজেন্টে পরিষ্কার করেই কাচি... কিন্তু ধবধবে সাদা কি হয়?"

"এ ব্যাপারে আমি কিন্তু সামান্য একটু বেশি নজর দিই।

রবিনে ডুবিয়ে ধবধবে সাদা করে নিই।"

আপনার মতো আমিও বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট দিয়েই কাপড় কাচি–কিন্তু শুধু ডিটারজেন্টে ঠিক যেন ধবধবে সাদা হয় না।

তাই তো **রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে** একবার ডুবিয়ে সত্যিকারের সাদা করে কাচা শুরু করলাম।

রবিন কাপড় চোপড় ধবধবে সাদা করার উপাদান। এতে তেমন কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য নেই যা আপনার কাপড়ের রং জ্বলিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

রোজ কাপড় ধোবার পর রবিনে ডোবালে দেখবেন দিনে দিনে ধবধবে ভাবটা বেড়েই চলেছে। আর আপনার কাপড় জামা বা হাতেরও কোন ক্ষতি হবে না।

জামা কাপড় যেমন কাচেন, তেমনিই কাচুন। শুধু কাচবার পর একবার রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে ডুবিয়ে নিন। দেখবেন কি ধবধবে সাদা হয়ে গেল। আর পাঁচজনে দেখলে ভাববে, বাঃ! কাচবার পর কি যত্ন নিয়ে সাদা করা।

Dip-it-in Robin
for extra whiteness.
Super safe for clothes.

রবিন
ফেব্রিক হোয়াইটনার

এখন পাবেন সুবিধাজনক স্যাশেতে!

কাপড় জামা একবার ডোবালেই ধবধবে সাদা, সম্পূর্ণ নিরাপদ!

CLARION C-RCR-1

টিনটিন

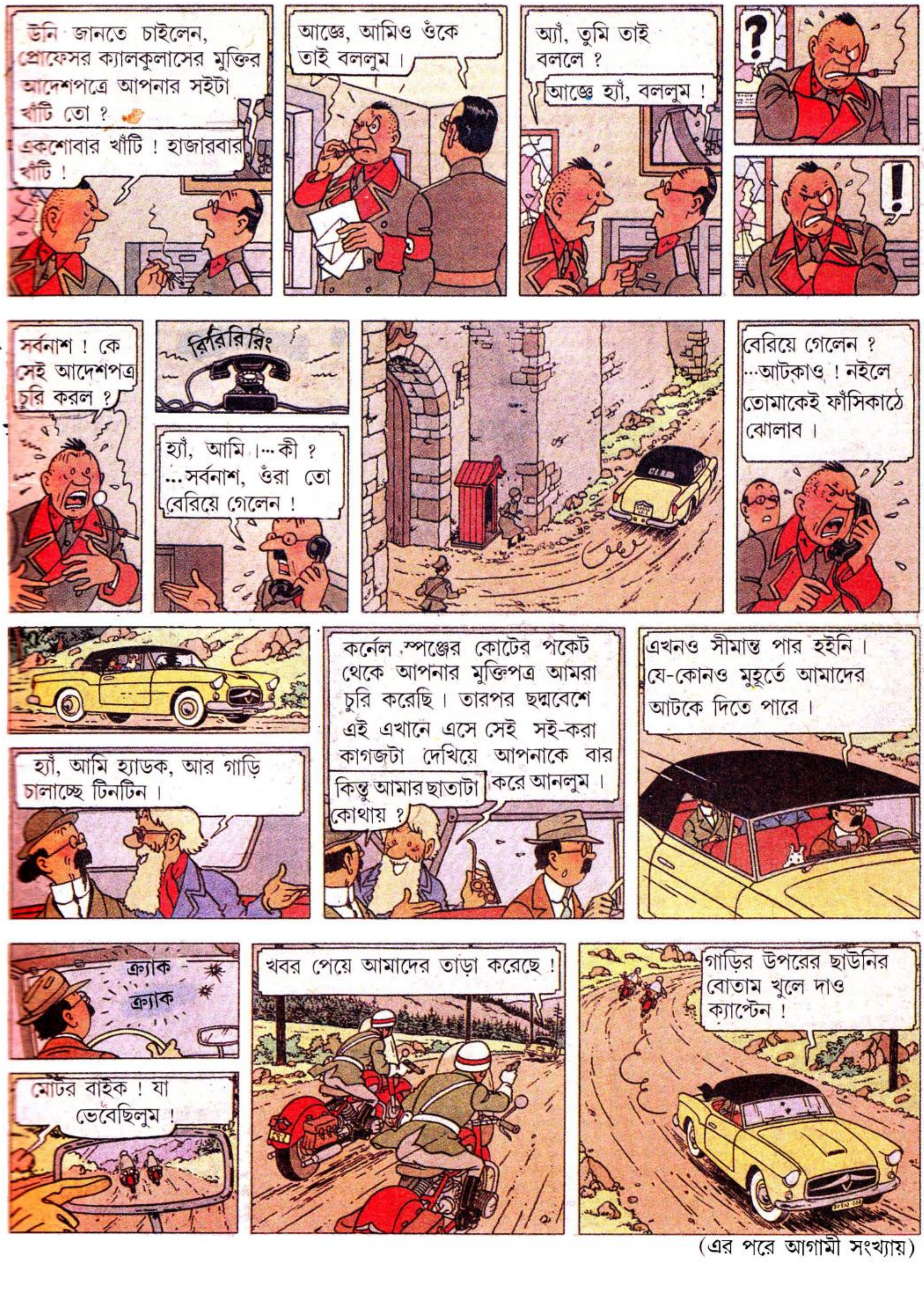

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মালদহ জিলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

উত্তরবঙ্গে যে-ক'টি নামী স্কুল আছে, মালদহ জিলা স্কুল তাদের মধ্যে একটি। শুধু লেখাপড়া কিংবা পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্যই নয়, নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকেও এই স্কুলের খুব সুনাম আছে। মালদহ শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মালদহ জিলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৮৫৮ সালে। পুরনো কাগজপত্র অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই ঐতিহ্যবাহী স্কুলটির গোড়ার দিকের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায়, স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষানুরাগী মানুষের উদ্যমে এবং অর্থানুকূল্যে এই স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। মালদহ জিলা স্কুলের বহু ছাত্র ভবিষ্যৎ-জীবনে সুখ্যাত হয়েছেন। বিনয়কুমার সরকার, অমরেশ বাগচী, প্রথমনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যাত্মানন্দ), করুণাকেতন সেন, কে· আহম্মদ, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, মোহিনীকান্ত ঘটক, সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এস· দাশ, রশিদুজ্জামান, বাণেশ্বর দাস, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অজিত দত্ত এঁদের মধ্যে উজ্জ্বল নাম।

মালদহ জিলা স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৭৪০। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট ভাল। ১৯৮২ সালে এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৬২ জন। উত্তীর্ণ হয়েছিল ৫৯ জন। ১২ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল। ১৯৮৩ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪। প্রথম বিভাগ ১৬ জন। ১৯৮৪ সালে পরীক্ষা দিয়েছিল ৮১ জন ছাত্র। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ২০ জন। ১৯৮২ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৮৫·৫, ১৯৮৩ সালে ৮১·৫ এবং ১৯৮৪ সালে শতকরা ৮৮। ১৯৮৩ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এই স্কুলের ছাত্র জয়দেব চক্রবর্তী ষোড়শ স্থান অধিকার করেছিল।

স্কুলের বর্তমান অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক শ্রীপূর্ণব্রত সরকার ১৯৫৩ সাল থেকে এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ.।

পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য কীভাবে তৈরি হতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানশিক্ষক জানালেন, **"পাঠ্যবই সম্পূর্ণ পড়তে হবে। ক্লাস ফাঁকি দিলে চলবে না। পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের কথায় উত্তর লিখতে হবে। যতটুকু চাওয়া হয়েছে, লিখতে হবে ঠিক ততটুকুই, তার কম বা বেশি নয়।** বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এলোমেলো অনেক কিছু লিখতে গিয়ে এত সময় নষ্ট করে যে, শেষ পর্যন্ত সব প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে লিখতে পারে না। নম্বর কম ওঠে। এদিকে সতর্ক থাকতে হবে, **সর্বদাই উত্তর হবে 'ব্রিফ অ্যাণ্ড টু দি পয়েন্ট'**। বাড়িতে নিয়মিত প্রশ্ন-উত্তর লিখে অভ্যাস করতে হবে। ভাষার শুদ্ধতার দিকে সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।"

"বানান ভুল করে না, ভাষায় সাধু-চলিতের মিশেল দেয় না, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হাতের লেখায় শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারে, এমন ছাত্রছাত্রী হাতে গোনা যায়।"

ইংরেজি ও বাংলা কীভাবে পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসরকার জানালেন, "অধিকাংশ ছেলেমেয়ে মনে করে ৩০ নম্বর তুলতে পারলেই যখন পাশ, তখন বেশি পড়ার দরকার কী? ফলে এই প্রধান ভাষা দুটিতে ছেলেমেয়েরা বেশ পিছিয়ে থাকে। **ইংরেজির প্রতি অনাগ্রহ আর আতঙ্ক সত্যিই খুব চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে**। এটা মোটেই ঠিক নয়। আমি মনে করি, **শিক্ষার সর্বস্তরে ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত**। বেশির ভাগ স্কুলে ইংরেজির সুযোগ্য শিক্ষকও নেই—ভাল শিক্ষকই ছাত্রদের ভীতি ও অনীহা দূর করতে পারেন। ছেলেমেয়েদেরও তৎপর হতে হবে। গোড়া থেকেই ভাষার উপর জোর দিতে হবে, অর্থাৎ কিনা ভাষাটিকে ভালবেসে খুঁটিয়ে পড়তে হবে পাঠ্যবই। পাঠ্যবই যদি যত্নের সঙ্গে পড়া থাকে, যে ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন, উত্তর লিখতে অসুবিধে হবে না।

"বাংলার ব্যাপারেও এই একই কথা। **ক্লাসে বাংলার যে বই পড়ানো হয়, সেটা তো আগাগোড়া ভাল করে পড়তে হবেই, সেই সঙ্গে ব্যাকরণও পড়তে হবে খুব ভাল করে। ব্যাকরণ একটু খটোমটো বটে, কিন্তু মন দিয়ে পড়লে এই খটোমটো ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না, নম্বরও ওঠে চমৎকার**। আসলে ব্যাকরণই হচ্ছে সব, **ব্যাকরণকে অবহেলা করে বাংলা ইংরেজিই শুধু নয়, কোনও ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যায় না**।" আমাদের আলোচনায় যোগ দিয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীপ্রীতিরঞ্জন ভট্টাচার্য বললেন, "অন্য বিষয়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা যতটা গুরুত্ব দেয়, বাংলায় ততটা দেয় না। শুদ্ধভাবে বাংলা শেখা ও বলার জন্য যে উদ্যোগের দরকার, দুঃখের বিষয়, সেটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেই। ফলে প্রতি বছরই বাংলায় বিস্তর ছেলেমেয়ে ফেল করে। বানান ভুল করে না, ভাষায় সাধু-চলিতের মিশেল দেয় না, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হাতের লেখায় শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারে এমন ছাত্রছাত্রী হাতে গোনা যায়।"

অঙ্ক সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক জানালেন, "অঙ্কের চেয়ে বেশি নম্বর আর কোনও বিষয়ে ওঠে না। অথচ কী দেখছি, এই বিষয়টিকে ছেলেমেয়েরা একটি ভয়ের চেহারা দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু **অঙ্কে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। বিষয় হিসেবে অঙ্ক চমৎকার, একটু বুদ্ধি খেলালেই নির্ভুল সমাধান হয়ে যায়। বাড়িতে রোজ রুটিন করে অঙ্ক কষতে হবে। চর্চা না থাকলে জানা অঙ্কও অনেক সময় ভুল হয়ে যায়।"**

ইতিহাস সম্পর্কে শ্রীসরকার বললেন, "এবারের পরীক্ষায় সিন্ধু সভ্যতা এসেছে, সামনের বার নিশ্চয়ই বৈদিক সভ্যতা আসবে, এইরকম ভেবে নিয়ে বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ইতিহাস পড়ে, পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়। এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। ইতিহাসের পাঠ্য অংশ খুঁটিয়ে পড়তে হবে, তা না হলে সালতারিখ ঘটনাপঞ্জি এগুলো কিছুই মনে থাকবে না। **ইতিহাসে অতিরঞ্জন এবং কল্পনার স্থান নেই, উত্তর হবে প্রাঞ্জল ও তথ্যানুগ**।"

বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রীজগদীশচন্দ্র মল্লিক তাঁর বিষয় সম্পর্কে বললেন, **"বিজ্ঞানে একটি নয়, একাধিক বই পড়তে হবে।"** টেস্টপেপারের বিভিন্ন বছরের প্রশ্ন দেখে উত্তর তৈরি করতে হবে। মেড ইজি জাতীয় বই পরিহার করতে হবে। **বিজ্ঞানের প্রতিটি সংজ্ঞা বুঝে মুখস্থ করা দরকার**। কারণ, বিজ্ঞানে আবোলতাবোল লেখার কোনও সুযোগ নেই।"

ভূগোলের শিক্ষক শ্রীসুধাংশু কর্মকার তাঁর বিষয় সম্পর্কে বললেন, **"ভূগোল অবশ্যই ম্যাপ দেখে পড়তে হবে। প্রতিটি উত্তরের সঙ্গে যদি ম্যাপ এঁকে দেখানো যায়, উত্তরটি স্পষ্ট হবে, নম্বর বাড়বে, পরীক্ষকও খুশি হবেন**। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সহায়ক বইও খুব যত্নের সঙ্গে পড়া উচিত।"

কর্মশিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক শ্রীসরকার জানালেন, "কর্মশিক্ষা বিষয় হিসেবে ভাল, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহও আছে, কিন্তু এই বিষয়টি ভবিষ্যৎ-জীবনে কতটা কাজে লাগবে জানি না।"

'আনন্দমেলা' সম্পর্কে প্রধানশিক্ষকের অভিমত, "আনন্দমেলা ছোটদের একটি আদর্শ পত্রিকা। ছোটরা যেভাবে এই পত্রিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, এর থেকে এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বুঝতে পারি।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

বার্ষিক পরীক্ষায় ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৭৬৭ পেয়ে নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে শ্রীকৌশিক বসু। শান্ত, নিরীহ, ছোটখাটো চেহারা কৌশিকের, কিন্তু ওর চোখেমুখে প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। কৌশিক জানাল, বার্ষিক পরীক্ষায় ও আরও ভাল আশা করেছিল, কিন্তু হয়নি। মাধ্যমিকে সেটা পুষিয়ে নিতে হবে। ক্লাস সেভেন থেকে মালদহ জিলা স্কুলে পড়ছে কৌশিক, আগে পড়ত ঝাড়গ্রামের কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশানে। ক্লাসের সেকেণ্ড বয় নীলাদ্রি চক্রবর্তীর সঙ্গে পড়াশোনার ব্যাপারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই প্রতিযোগিতা অনেকটা খেলার মতো, হার-জিত আছে, খুব ভাল লাগে কৌশিকের।

কৌশিকের বাবা শ্রীকানাইলাল বসু মালদহের অ্যাডিশনাল এস· পি·। মা শ্রীমতী গীতা বসু। কৌশিকের কোনও গৃহশিক্ষক নেই। বাবা প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও ছেলের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেন, বিভিন্ন বিষয় দেখিয়ে দেন। মা

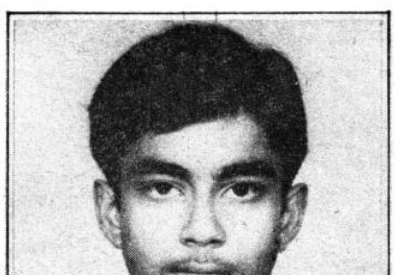

পড়ান বাংলা আর ইতিহাস।

প্রতিদিন ৭/৮ ঘণ্টা পড়ে কৌশিক, নিয়ম করে। ছুটির দিনে আর-একটু, বেশি।

কৌশিক ক্রিকেট খেলে, স্কুলে ভাল খেলার জন্য ওর সুনাম আছে। ওর প্রিয় ক্রিকেটার গাওস্কর।

কৌশিকের প্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, এবং সত্যজিৎ রায়। প্রিয় বিদেশী লেখক তলস্তয়।

কৌশিক ভবিষ্যতে আই· আই· টি· থেকে একজন নামী ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

কৌশিক বাংলায় চক্রবর্তী ও পালচৌধুরীর বই পড়ে। ইংরেজিতে পড়ে পি· কে· দে সরকার ও পি· মাহাতোর বই। অঙ্কে পড়ে কেশবচন্দ্র নাগ ও রায়চৌধুরীর বই। ভূগোল : বসু-ভট্টাচার্য, গৌতম মল্লিক। ইতিহাস : কিরণ চৌধুরী, নিমাইসাধন বসু। ভৌতবিজ্ঞান : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমর গুহ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই। জীবনবিজ্ঞান : নন্দী-গুহ-বর্ধন, কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু। অতিরিক্ত গণিত : কেশবচন্দ্র নাগ, মাইতি-মাইতি।

কৌশিকের প্রিয় পত্রিকা একটিই। তার নাম 'আনন্দমেলা'। এই পত্রিকার 'লেখাপড়া' বিভাগ সবচেয়ে ভাল লাগে। 'লেখাপড়া' বিভাগে তার ছবি ছাপা হবে শুনে কৌশিক লাজুকমুখে বলল, "ছবি ছাপা হলেই তো হল না, এই সঙ্গে আমার দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেল। পরীক্ষায় ভাল ফল করে আমি যদি সবাইকে খুশি করতে পারি, তবেই এই ছবি ছাপার সার্থকতা।"

রোভার্সের রয়
লিগের শীর্ষস্থান নিয়ে পোর্ট ডিন আর রোভার্সের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। আজ পোর্ট ডিনের শেষ খেলা কারফোর্ডের সঙ্গে। সঙ্গীদের নিয়ে রয় খেলা দেখতে এসেছে
লড়ে যাও কারফোর্ড !
চালিয়ে যাও !
খেলা এখনও ড্র চলছে, রয় !
CARFORD
CARFORD
কিন্তু শেষ মুহূর্তে ...
পোর্ট ডিন জিতে গেল !
কতক্ষণ আর আটকে রাখবে !
অবস্থাটা তা হলে কী দাঁড়াল ?
খেলা শেষ হবার পরে ...
আমরা এক পয়েন্ট পিছনে, একটা খেলা বাকি। ড্র করলেও গোল-অ্যাভারেজে আমরাই লিগ পাব।
রোভার্সের আজ শেষ খেলা, স্যাণ্ডফোর্ডের সঙ্গে। টিভির ভাষ্যকার বলছে ...
রোভার্স আজ ফুল টিম নামিয়েছে !
স্যাণ্ডফোর্ড !
রোভার্স !
রোভার্সে আজ খেলছে চার্লি, গাথরি, ম্যাকে, গাইল্‌স, স্লেড, ওয়ালেস, ডিয়াজ, ব্ল্যাকি, রয়, জেরি আর এলিয়ট ...
ক্লাবের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন, রোভার্স লিগ জিতলেই তিনি মস্ত পুরস্কার দেবেন। আর ড্র করলেই তো জয় !
বাস্‌ রে !
কিক-অফের পরে ...
এক পয়েন্ট নয়, দুটো পয়েন্টই ছিনিয়ে নিতে হবে !
প্যাকোকে বল দিয়েছে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে সেই গ্রামে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে এসে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল। তারপর দিপুও আর ফিরে এল না। পরদিন সকালে ইরানি তার ভাইকে খুঁজে না পেয়ে গেল থানায় খবর দিতে। থানার বড়বাবু তাকে নিয়ে এলেন শ্মশানের কাছে এক সাধুবাবার কাছে। এদিকে কলকাতায় দিপুর বাবা ওদের খবর না পেয়ে ছটফট করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর এক ডাক্তারবন্ধু ও এক পুলিশসাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন বর্ধমানের দিকে। রাস্তায় এক জায়গায় তাঁদের জিপ খারাপ হয়ে গেল। তারপর···

জিপগাড়িটা সারাতে সারাতে সকাল দশটা বেজে গেল। রীতিমতন চড়া রোদ। বাবা খুব মন-মরা হয়ে গেছেন। রমেন সরকার অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন সামনের রাস্তায়। তাঁর মেজাজ বেশ গরম। তাঁর ধারণা এই ছোট জায়গার মেকানিকরা কিছুই কাজ জানে না, এরা আরও খারাপ করে দিচ্ছে গাড়িটা। এর মধ্যে নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে অকারণে বকুনি দিয়েছেন কয়েকবার।

পরিতোষ ডাক্তার অন্য একটা গাড়ির খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। এক জায়গায় তাঁর চেনা একজন পেশেন্ট আছে। কিন্তু এত ছোট জায়গা, এখানে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না।

যাই হোক, জিপগাড়িটা শেষ পর্যন্ত চালু হল। রমেন সরকারকে একটা জরুরি তদন্তে বর্ধমানে যেতে হবে। তিনি মেমারিতে এসে বর্ধমানে ফোন করলেন। সেখানকার সব খবর-টবর নিয়ে জানলেন যে, বর্ধমানের এস· পি· অনেকখানি কাজ এগিয়ে রেখেছেন। তাঁর এক্ষুনি যাবার দরকার নেই।

রমেন সরকার বাবাকে বললেন, "চলুন অরুণবাবু, আগে আপনাদের সঙ্গে ঘোড়াডাঙা ঘুরে আসি। আপনাদের আমি দেরি করিয়ে দিলাম, সেজন্য লজ্জিত।"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "দেরি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন ভালয়-ভালয় সবাইকে ফিরে পেলেই হয়।"

বাকি রাস্তাটা সবাই চুপচাপ রইলেন। বাবা ঘন-ঘন হাঁটু দোলাচ্ছেন। পরিতোষ ডাক্তার শুধু একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাল রাত্তিরে এখানে খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে শুনেছিলুম। কই, কোনো চিহ্ন তো দেখছি না। আকাশ পরিষ্কার।"

প্রথমে আসা হল থানায়। সেখানে বড়বাবু নেই। একজন কনস্টেবল সব ঘটনা জানাল। ইরানি এসেছিল তার ভাই হারিয়ে যাবার খবর দিতে। তারপর দারোগাবাবু তাকে নিয়ে তদন্তে গেছেন।

দিপুও হারিয়ে গেছে শুনে বাবার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমার দাদা···দিপু···এসব কী ব্যাপার? আমার ছেলেটা বড় খেয়ালি, কখন যে কী করে ঠিক নেই, ওকে কেউ অনায়াসেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে পারে···"

রমেন সরকার বললেন, "আগে থেকেই ব্যস্ত হবেন না। চলুন, আপনার দাদার বাগানে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী। একজন বুড়োমানুষ আর একটা বাচ্চা ছেলে একই জায়গা থেকে হারিয়ে গেল, এটা খুবই অস্বাভাবিক!"

জিপটা এসে থামল জ্যাঠামশাইয়ের বাগানের পুকুরধারে। গাড়ির আওয়াজ শুনেই মধু দৌড়ে এসেছে। বাবাকে সে চেনে। তাকে প্রণাম করেই মধু কাঁচুমাচু ভাবে বলল, "খোকাবাবু এখনও ফেরেনি! আমি চারধারের সব ক'খানা গাঁয়ে লোক পাঠিয়েছিলুম, কেউ কোনও খবর দিতে পারল না!"

বাবা বললেন, "কী হয়েছিল? দিপু কখন হারিয়ে গেল?"

মধু বলল, "সেটাই তো কেউ জানে না! রাত্রে ভাই-বোনে ঘুমোতে গেল। আমি তারপরেও জেগে ছিলুম খানিকক্ষণ। সকালে উঠে দেখা গেল খোকাবাবু নেই। নিশ্চয়ই নিজেই ঘর থেকে বেরিয়েছে ভোরবেলা!"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "নিজে নিজে বেরিয়ে একেবারে উধাও হয়ে গেল? বাইরে থেকে কেউ এসেছিল?"

মধু বলল, "না, বাবু! কেউ আসেনি। রাত্তিরে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে কুকুর-বেড়ালও বেরোয় না।"

রমেন সরকার ওদের কথা শুনছেন বটে, আবার তিনি ঘুরে ঘুরে পুকুর আর পুড়ে যাওয়া পেয়ারাবাগানটাও দেখলেন। তারপর তিনি মধুর কাছে এসে বললেন, পুকুরটা একেবারে শুকিয়ে গেল কী করে? পেয়ারাবাগানেই বা আগুন লাগাল কে?"

মধু বলল, "আগুন লাগেনি স্যার! একটা সাঙ্ঘাতিক বাজ পড়েছিল, সে কী আওয়াজ! তাতেই পুকুরের এই দশা হল, আর পেয়ারাবাগানটা···"

রমেন সরকার বললেন, "বাজ পড়ে পুকুর শুকিয়ে যায়?"

মধু বলল, "আমিও তো এমন কথা শুনিনি। সেই সময় নাকি মেঘে আগুন লেগে গিয়েছিল, কাছাকাছি গ্রাম থেকে কেউ কেউ দেখেছে। সেই আগুনে পুকুরের জল ধোঁয়া হয়ে গেল।"

রমেন সরকার পরিতোষ ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, "রূপকথার গল্প মনে হচ্ছে না?"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "যাই বলুন, মনে হচ্ছে এখানে অলৌকিক কিছু ব্যাপার আছে। এখানে পৌঁছেই যেন কেমন কেমন লাগছে।"

বাবা জিপের পা-দানিতে বসে পড়ে বললেন, "মধু, আমার ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে পাঠালুম, তুমি তাদের চোখে-

চোখে রাখতে-পারলে না ? আমার দাদারই বা কী হয়েছে ?"

মধু বলল, "আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলেন, হাঁটুতে কষ্ট হচ্ছিল। সেই মানুষ রাত্তিরবেলা কোথাও যেতে পারেন ? বাইরে থেকে কেউ আসেনি, উনি সাইকেলেও যাননি, সাইকেলটা আগেই চুরি হয়ে গেছে ! জলজ্যান্ত মানুষটা কি অদৃশ্য হয়ে গেল !"

বাবা তাকালেন রমেন সরকারের মুখের দিকে। তিনি কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। তবু তিনি জোর করে হেসে বললেন, "একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। অলৌকিক বলে তো মেনে নেওয়া যায় না ! ইরানি কোথায়, থানার দারোগাই বা কোথায় ? শুনলাম যে তারা এদিকে এসেছে ?

মধু বলল, "তেনারা তো শ্মশানে সাধুবাবার কাছে গেছেন ?"

রমেন সরকার ভুরু তুলে বললেন, "শ্মশানে ? সাধুবাবার কাছে ? কেন ?"

মধু বলল, "কারুর কোনও জিনিস হারিয়ে গেলে সাধুবাবা বলে দিতে পারেন। সেই জন্যই গেছেন !"

রমেন সরকার ধমক দিয়ে বললেন, "ননসেন্স ! পুলিশ বিভাগের কি এই দুরবস্থা হল ? নিজেরা কোনও রহস্যের কিনারা করতে পারবে না, সাধু-সন্ন্যাসীর সাহায্য নেবে ! চলুন তো, দেখি সেই সাধুবাবাকে ! উঠুন, গাড়িতে উঠুন !"

মধু বলল, "শ্মশানের ধারে গাড়ি যাবে না। হেঁটে যেতে হবে।"

"চলুন, হেঁটেই যাব। কত দূর ?"

"বেশি দূর নয়, স্যার, দশ মিনিটের হাঁটা-রাস্তা !"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান ! আমরা যেতে পারি, অরুণ তো হাঁটতে পারবে না অতটা ! অরুণ তাহলে এখানেই থাকুক !"

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমি ঠিক হাঁটতে পারব। এখানে একা একা বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব !"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "অরুণ, তোমার পা এখনও ভাল করে সারেনি, তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।"

বাবা তবু জোর দিয়ে বললেন, "আমাকে বারণ করে লাভ নেই। আমি যাবই।"

রমেন সরকার বললেন, "শুনুন, ডাক্তারবাবু। মনের জোরটাই আসল কথা। উনি যদি মনে করেন হাঁটতে পারবেন, তাহলে ওঁকে বাধা দিচ্ছেন কেন ?"

লেবুবাগানের পাশ দিয়ে ওঁরা হাঁটতে শুরু করতেই গর্‌গর্‌ করে আকাশে মেঘ ডাকল। সব দিক কালো হয়ে এল। তারপরেই বৃষ্টি নামল।

এত জোর বৃষ্টি যে, এর মধ্যে হাঁটার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সবাই প্রায় দৌড়ে চলে এলেন ঘরের মধ্যে। সবাই দারুণ অবাক।

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "ব্যাপারটা কী হল বলুন তো ? রোদ ঝকঝক করছিল, আকাশে একটু মেঘ দেখিনি, হঠাৎ এরকম বৃষ্টি ?"

বাবা বললেন, "এত জোর বাজ ডাকার শব্দও তো শুনিনি।"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "অলৌকিক কিছু না হোক, এখানে একটা কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে নিশ্চয়ই।"

রমেন সরকার চিন্তিত মুখে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মধুকে ডেকে বললেন, "দু' একটা কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নিই। অরুণবাবুর দাদা, আপনার বড়বাবু, তিনি তো এখানেই থাকতেন বেশির ভাগ সময়, তাই না ? তিনি বেশি কলকাতাতে যাওয়াও পছন্দ করতেন না। তাহলে বাইরের কাজকর্ম কে করত ?"

মধু বলল, "দরকার হলে তিনি আমাকেই পাঠাতেন। এই তো আমি ঝাড়গ্রামে গেসলুম, ফরেস্ট অফিস থেকে ভাল-ভাল গাছের চারা আনতে !"

"বাইরের কোনও লোক ওঁর সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসত ?"

"আজ্ঞে না, স্যার। এই গ্রামের লোকজন কিছু আসত,

থানার দারোগা আসতেন, সে সবাই চেনা। অচেনা কেউ আসতেন না! আমি তো কখনও দেখিনি। তবে...”

“তবে কী?”

“উনি মাঝে-মাঝে আপন মনে কথা বলতেন। বিড়বিড় করে নয়, জোরে জোরে। পাশ থেকে কেউ শুনলে ভাবত, উনি বুঝি অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলছেন! আমাদের এককড়ি বলত, বড়বাবু গাছের সঙ্গে কথা বলেন।”

“এককড়ি কে?”

“আমাদের এখানে রান্না করত। আজ সকালে সে চলে গেছে।”

“আর একজন নিখোঁজ?”

“না, স্যার। সে নিজে-নিজেই চলে গেছে। সে একটু পাগলমতন তো!”

“হুঁ! আচ্ছা, ওর ব্যাপারটা পরে দেখছি। এবারে সাধুবাবার কথা শুনি! উনি এখানে কতদিন এসেছেন?”

“বেশিদিন না, মাস ছয়েক। আমাদের এই শ্মশানে মাঝে-মাঝেই বাইরে থেকে এক-আধজন সাধু আসে, আবার চলে যায় দু' চারদিন পর। এই সাধুবাবা অনেকদিন রয়ে গেলেন। ইনি একজন বড় তান্ত্রিক। লোকে এঁকে মানে।”

“তোমার বড়বাবুও কি এই সাধুবাবার কাছে যেতেন নাকি?”

“আজ্ঞে না। বড়বাবুর সাধু-সন্ন্যাসীতে তেমন বিশ্বাস ছিল না। আমাকে একদিন বলেছিলেন, মধু, ওই সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করে আয় তো, উনি ভূত দেখাতে পারেন কি না! তা হলে রাত্তিরের দিকে একদিন শ্মশানে যাব!”

“তুমি সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ। সাধুবাবা হেসে বলেছিলেন, না, তোমার বাবুকে বোলো, আমি নিজেই কখনও ভূত দেখিনি!”

পরিতোষ ডাক্তার দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর একবার খুব জোর বজ্রপাতের শব্দ হতেই তিনি ভয় পেয়ে খানিকটা পিছিয়ে এলেন।

বাবা বললেন, “দ্যাখো, দ্যাখো, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত কাণ্ড!”

রমেন সরকার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “বৃষ্টি হঠাৎ আরম্ভ হয়, হঠাৎ বন্ধ হয়, এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই। চলুন, এবারে সাধুবাবাকে দেখে আসা যাক।”

মধুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “দারোগাবাবুরা সেখানে কতক্ষণ আগে গেছেন?”

মধু বলল, “তা এক ঘণ্টার ওপর তো হবেই।”

পরিতোষ ডাক্তার বাবাকে বললেন, “অরুণ, তুমি আমার কাঁধে ভর দাও, আস্তে-আস্তে হাঁটো। আমি এখনও বলছি, তুমি এখানে থেকে গেলেই পারতে।”

বাবা বললেন, “আমি ঠিক আছি।”

এত বৃষ্টির পর মাটি খানিকটা কাদা-প্যাচপেচে হয়ে গেছে, ওঁদের আস্তে-আস্তেই এগোতে হল।

শ্মশানের পাশে এসে ওঁরা ইরানি বা দারোগাবাবু কাউকেই দেখতে পেলেন না। শুধু একজন লম্বামতন লোক দাঁড়িয়ে আছে একটা কুঁড়েঘরের বাইরে।

বাবা বললেন, “কেউ নেই তো! ওরা বোধহয় আবার এখান থেকে অন্য কোনও জায়গায় চলে গেছে!”

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, “সাধুবাবাটি গেলেন কোথায়? তাঁর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে!”

লম্বা লোকটি রমেন সরকারকে দেখে দৌড়ে এসে একটা স্যালুট দিল।

রমেন সরকার অবাক হয়ে বললেন, “আপনি কে? আপনিই এখানকার দারোগা নাকি?”

“না, স্যার। আমার নাম খয়েরলাল। আপনি আমায় চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমি পুলিশ সার্ভিসেই আছি!”

“খয়েরলাল? নামটা শোনা-শোনা! আগে তুমি ট্রেনে ট্রেনে ইয়ে করতে, না?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।”

“তুমি এখানে কী করছ? এই ভদ্রলোকের মেয়ে, তার নাম ইরানি, এখানকার দারোগার সঙ্গে সাধুবাবার কাছে এসেছিলেন, সে ব্যাপারে তুমি কিছু জানো?”

“জানি স্যার। এখানে যা-সব কাণ্ড ঘটছে স্যার, দেখেশুনে একেবারে হাঁ হয়ে গেছি!”

“এবারে হাঁ-টি বন্ধ করো। এঁর মেয়ে কোথায়? সাধুবাবাটি কোথায়?”

“ওই ঘরের মধ্যে। কিন্তু ওখানে এখন যাবেন না স্যার। আওয়াজ হলে মুশকিল হয়ে যাবে। তাই তো আমি বাইরে পাহারা দিচ্ছি!”

“তার মানে?”

ইরানি ওই ঘরের মধ্যে আছে শুনেই বাবা আর পরিতোষ ডাক্তার সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, খয়েরলাল দৌড়ে গিয়ে তাঁদের বাধা দিয়ে বলল, “ওভাবে যাবেন না। দাঁড়ান, আগে সাধুবাবাকে ডাকি।”

খয়েরলাল পা থেকে জুতো খুলে পা টিপে-টিপে ঢুকে গেল কুঁড়েঘরের মধ্যে। তারপর সাধুবাবাকে ডেকে আনল বাইরে।

সাধুবাবা এসে তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “নমস্কার।” তারপর বাবার মুখের দিকে চোখ রেখে বললেন, “আপনার মেয়ে ভাল আছে। চিন্তার কিছু নেই। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে।”

বাবা বললেন, “আমি এক্ষুনি তাকে দেখতে চাই।”

সাধুবাবা বললেন, “একটুখানি অপেক্ষা করুন, এখন ওর ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না।”

পরিতোষ ডাক্তার কড়া ভাবে বললেন, “ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না! তার মানে? এই অসময়ে সে ঘুমোবে কেন? কী হয়েছে সত্যি করে বলুন তো!”

সাধুবাবা বললেন, “বোঝানো সত্যিই মুশকিল। এক কাজ করুন তা হলে। সবাই জুতো খুলে আসুন, দেখবেন, যেন কোনও শব্দ না হয়।”

সেইভাবেই সবাই চলে এল কুঁড়েঘরটার ভেতরে। সেখানে সাধুবাবার কম্বলের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে ইরানি। চোখ বোঁজা, মুখে একটু-একটু হাসি। কী যেন মাঝে-মাঝে বলছে বিড়বিড় করে।

একবার সে বলে উঠল, “তুই সত্যি কথা বলছিস, দিপু? বানাচ্ছিস না তো?” (ক্রমশ)

ছবি: অনুপ রায়

গাওস্কর বললেন, "আমি বরং বল করি ।"

গলির গাওস্কর

অশোক রায়

"আসছেন হোল্ডিং, ব্যাট হাতে গাওস্করও প্রস্তুত। দ্বিতীয় বল—" মিণ্টুর রানিং কমেণ্টারি থেকে কান সরিয়ে নিল পিকু।

হাফভলি। ভেতরে ভেতরে চনমন করে উঠল পিকু। সজোরে লিফট করল। ব্যাটে লাগামাত্র হাফভলিটা বোলারের মাথা টপকে সোজা গিয়ে পড়ল সামনের বাড়ির দোতলার কাঁচের শার্শিতে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচটা।

এতক্ষণ ধরে প্রতিটি বলের সঙ্গে ঝড়ের গতিতে রানিং কমেণ্টারি দিচ্ছিল মিণ্টু, বিভিন্ন ধারাভাষ্যকারের গলা হুবহু নকল করে। ঘটনার আকস্মিকতায় সেও হঠাৎ চুপ করে গেল। এই রকম পরিস্থিতিতে কমেণ্টারি চালাবার মতো শব্দসম্ভার মিণ্টুর ছিল না। শেষ পর্যন্ত দ্রুতগতিতে "অবস্থা খুবই খারাপ, আমরা এখন স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি, নমস্কার—" বলেই কাল্পনিক মাইক বন্ধ করে মিণ্টু চোখের পলকে লম্বা দৌড় মারল।

ওদিকে চন্দনের বুড়ি-দিদিমার খ্যানখ্যানে গলার চিৎকারে তখন পাড়া মাথায়। "দিলে, দিলে সব ভেঙে-চুরে দিলে হতচ্ছাড়াগুলো।"

সাদা থান-পরা চন্দনের দিদিমাকে পাড়ার সবাই আড়ালে কস্তুদিদিমা বলে। কারণ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই ভয়ংকর শুচিবায়ুগ্রস্ত দিদিমা ব্যস্ত থাকেন ঝাঁটা হাতে উঠোন পরিষ্কারের কাজে। কেউ কেউ অবশ্য ওঁকে লাউড-স্পিকারও বলে। সেটারও একটা কারণ আছে। ও বাড়ি থেকে প্রায়ই ঝগড়ার শব্দ ভেসে আসে। এবং শুরুর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষ বলে আর কিছু থাকে না। বহু-ব্যবহৃত সস্তা গানের রেকর্ড পুরনো লাউড-স্পিকারে ফুল ভলিউমে বাজালে যেমন শব্দ হয়, তেমনি কর্কশ কণ্ঠে এক-তরফা চিৎকার করতে থাকেন দিদিমা। গোটা ব্যাপারটা যেন লিগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান বনাম লিগের শেষ স্থানাধিকারীর ম্যাচ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবেশীরাও অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে গেছেন আপত্তি জানালে চিৎকারের তীব্রতা বাড়ে। এবং বাক্যের ছুঁচলো মুখগুলো দিক পালটে ছুটে আসে তাঁদেরই দিকে। সুতরাং দিদিমার তোপধ্বনি শুরু হলেই প্রতিবেশীরা দ্রুত জানলা বন্ধ করে দেন শ্রবণেন্দ্রিয়টি বিকল হবার আশঙ্কায়।

দুটো বাড়ির ফাঁকে একফালি মাটির গলিতে 'টেস্ট ক্রিকেট' বেশ জমে উঠেছিল। স্কুলের পড়ার চাপ সামলে এই রবিবার দিন সকাল নটায় জমাটি টেস্ট ম্যাচের আসর বসে। আজও খেলা সবে জমে উঠেছিল। গলির ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী সামনের বাড়ির দোতলায় বল লাগলে 'ছক্কা' হবার কথা। কিন্তু ছক্কা হাঁকানোর সুখটুকু বেশিক্ষণ উপভোগ করার সময় পিকুর হাতে ছিল না। ইতিমধ্যেই পিকু দেখে নিয়েছে চন্দনের দিদিমার ক্রমবর্ধমান চিৎকারে চারপাশের বারান্দা এবং জানলায় একটি দুটি করে গম্ভীর মুখ জমতে শুরু করে

দিয়েছে। কাঁচ ভাঙার পরিণতির কথা ভেবেই পিকুর গাটা শিরশির করে উঠল ভয়ে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল পিকু। সব ভোঁ-ভাঁ। পলাশ, তাতাই, বাপি, মিণ্টুরা নিমেষে উধাও! ঠিক যেন ম্যাজিক। এমনকী খানিক আগে একটা বাম্পারে অপ্রস্তুত করে যে বুবাইটা বিশ্রীভাবে হাসছিল সেও কোন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কলকাতায় নেই, ফলে এ-সংখ্যায় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস 'গোলমাল'-এর কিস্তি তিনি লিখতে পারলেন না। আশা করছি, আগামী সংখ্যা থেকে 'গোলমাল' নিয়ে আর-কোনও গোলমাল হবে'না।

ফাঁকে হাওয়া। কিন্তু এই নিয়ে আর ভাববার সময় ছিল না পিকুর। হাতের ব্যাট বগলে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল সেও।

ছুটতে ছুটতেই পিকুর সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি ধাক্কা লাগল এক ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে ধরে না ফেললে পিকু হয়তো পড়েই যেত।

ভদ্রতা করে পিকু মুখটা তুলে কোনমতে বলল, "ধন্যবাদ।"

চোখাচোখি হতেই পিকু দেখল ভদ্রলোক মুচকি-মুচকি হাসছেন। মুখটা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল পিকুর। তবে কোথায় দেখেছে চট করে মনে পড়ল না।

বেঁটেখাটো শক্ত চেহারার ভদ্রলোকটি ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটা ধরে রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে চিনতে পারছ?" আর একবার মুখের দিকে তাকাতেই পিকুর মনে পড়ে গেল সব। আত্মবিস্মৃতভাবে পিকু বলে উঠল, "আপনি সুনীল গাওস্কর?"

গাওস্কর কথা বললেন না। শুধু তাঁর মাথাটা নড়ে উঠল একটুখানি।

পিকু বুঝে উঠতে পারছিল না যে কী করবে। আনন্দে, বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে ভাবছিল এই মুখের মানুষটিকেই সে কয়েকদিন আগে বাবার সঙ্গে ইডেনে খেলতে দেখে এসেছে। এই মানুষটির নানা ভঙ্গির ছবি তার ছবি জমানোর খাতায় যত্নের সঙ্গে জমানো আছে।

গাওস্কর বললেন, "ব্যাট হাতে কোথায় ছুটছ?"

"ওই চন্দনের দিদিমা—" বলেই পিকু থেমে গেল। ক্রিকেট মাঠ থেকে তার পালানোর ঘটনাটি এত বড় একজন ক্রিকেটারের সামনে বলতে কেমন যেন সঙ্কোচবোধ করল পিকু।

কী আশ্চর্য! পিকুর আড়ষ্ট ভাবটা ঠিক ধরে ফেললেন গাওস্কর। ঠিক যেমন করে খেলতে খেলতে বোলারদের চালাকি ধরে ফেলেন। বললেন, "তোমার স্ট্রেট ওভার বাউণ্ডারিটা জানলার কাঁচ ভেঙেছে, এই তো?"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো একবার মাথা নাড়ল পিকু।

"জানো, কিথ মিলারের একটা সিক্সার একবার একটা বাড়ির কাঁচ ভেঙে দিয়েছিল ঠিক ওইভাবে। ছেলেবেলায় আমার একটা শট লেগে আমার মায়ের নাক থেকে অনেক রক্ত বেরিয়েছিল।"

পিকু আচ্ছন্নের মতো কথা শুনছিল।

গাওস্কর বললেন, "ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে এই রকম কত দুর্ঘটনা ঘটে। চলো আবার খেলা শুরু করা যাক।"

শুধু এই একটা শব্দের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল পিকু। বুক ফুলিয়ে গাওস্করের সঙ্গে পরিত্যক্ত ক্রিকেট রণক্ষেত্রে ফিরে এল পিকু। পাশাপাশি হাঁটার সময় পিকু একবার আড়চোখে দেখে নিল লম্বায় সে গাওস্করের থুতনির কাছে পৌঁছেছে।

পিকুকে ফিরতে দেখে কোথা থেকে এক এক করে ফিরে এল তাতাই, বাপি, মিণ্টু, পলাশরা। দেখতে দেখতে চারপাশে ভিড় জমে গেল। একটা খুশি-খুশি ভাব একটু একটু করে জমা হচ্ছিল পিকুর মনে।

গাওস্কর বললেন, "তুমি ব্যাট করো, আমি বরং বল করি।"

গাওস্করের সামনে ব্যাট! এই একটা কথাতেই পিকুর শরীর ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল। পা দুটোকেই কেমন যেন আড়ষ্ট মনে হল। সারা পৃথিবীর লোক যাঁকে ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বশ্রেষ্ঠদের একজন বলে মেনে নিয়েছে তাঁর সামনে ব্যাট হাতে নামতে ভীষণ ভয়-ভয় করছিল পিকুর।

পিকুর অসহায় অবস্থাটা বুঝে এগিয়ে এলেন গাওস্কর। পিকুর পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন "ভয় কী? ঠিক খেলতে পারবে।"

পিকু ব্যাট হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। গাওস্কর বল করলেন। পিকু দু-চোখ বন্ধ করে সজোরে ব্যাট চালাল।

"এই কী করছিস?" মা'র ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল পিকু। শীতের নরম রোদ জানলা দিয়ে এসে পড়েছে খাটের ওপর। চারপাশে শূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পিকু কান্না-কান্না গলায় বলে উঠল, "মা, গাওস্কর কোথায়?"

বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছিস?"

পিকু আর কিছুই বলতে পারল না। ওর গলার কাছে যন্ত্রণার মতো তীব্র একদলা কান্না চাপ হয়ে আটকে গেল।

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনটি এবার দারুণ কাটল আমাদের। একে তো এবার নববর্ষ পড়েছিল রবিবারে, ফলে, অন্য বার যারা সাহেবি ধাঁচের অফিস বলে ছুটি পায় না, তারা এবার দারুণ খুশি। তার মধ্যে একজন অবশ্যই ছোট্কা। অন্যান্য বছর ছোট্কা অবশ্য বিকেলবেলায় বিশুদ্ধ বাঙালি বেশে ঘুরে বেড়ায়। প্যান্ট-শার্ট-টাই খুলে ফেলে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর তাঁতের ধুতি পরে ছোট্কা সন্ধেবেলায় প্রত্যেকবার চলে যায় বইপাড়াতে। সেখান থেকে আরও কয়েক জায়গায়। এ-বছর সকাল থেকেই দেখলাম ছোটকার দারুণ মেজাজ। সাতসকালে বাজারে গিয়েছিল ছোট্কা। ফিরে এল মাংস নিয়ে। এক রকম নয়, দু' রকম মাংস। একটা দিয়ে হবে মাটন বিরিয়ানি, অন্যটায় চিকেন কষা। ছোট্কার তত্ত্বাবধানেই রান্না হল। রান্না করল ছোড়দি আর গৌরী—মানে আমার সেই মামাতো বোন। রান্না কেমন হল জিজ্ঞেস কোরো না। কেননা, নাম যত জব্বর, স্বাদ তেমন-কিছু আলাদা বলে আমার অন্তত মনে হয়নি। তবে হ্যাঁ, মজা হল বিস্তর। আর সেই সঙ্গে মিলল সুন্দর একটা ধাঁধা। হ্যাঁ, এটাও ছোট্কার আমদানি। এবং এর মধ্যেও মিশে আছে ছাগল এবং মুরগি। শুনবে ধাঁধাটা? একেবারে যাকে বলে নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।

প্রথম ধাঁধা ॥ একজন চাষির কিছু মুরগি ছিল, কিছু ছাগল ছিল। মুরগির সংখ্যা ছাগলের সংখ্যার দ্বিগুণ। আর, মুরগি ও ছাগলের মাথা ও পায়ের সংখ্যা যোগ করলে হয়—নিরানব্বই। এবার বলো তো, চাষির খামারে কটা মুরগি ছিল আর কটা ছাগল?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পাঁচ অক্ষরের চেনা ইংরেজি শব্দ। দুটো অক্ষর সরিয়ে নিলে যা পড়ে থাকে তা হল, ইংরেজিতেই, এক। শব্দটা কী বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পরের সংখ্যা দুটো কী-কী?

৩, ৬, ১২, ২৪, ?, ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ক। (২) ১৫৭। (৩) ছায়া।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	
■		■	■	■		■
৫		৬		৭		৮
	■	৯			■	
১০	১১		■	১২	১৩	
■		■	■	■		■
১৪			■	১৫		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) অনুসন্ধান। (৩) বেদনাহীন। (৫) শিবের উৎসব। (৭) সুগন্ধি ফুলবিশেষ। (৯) এক টুকরো কাপড়, খুবই সে দরকারি। (১০) বীজরোপণ। (১২) লুচি-জাতীয় খাবার। (১৪) ফুলবিশেষ, সাধারণত সাদা হয়। (১৫) গাছের যে-অংশ মাটির নীচে থাকে।

উপর-নীচ : (২) অসুর। (৪) সুকুমার রায় হাঁসের সঙ্গে কোন্ প্রাণী মিলিয়ে এক আজব জীব কল্পনা করেছেন? (৫) অর্জুনের ধনুক। (৬) দুমুখো নামের অস্ত্র। (৭) পাখির থাকে। (৮) কতজনই কাটে, দু-দশ জনার জোটে। (১১) সাপ। (১৩) পানীয় বস্তু কী দিয়ে খায়?

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

পু	ন	র্ব	সু	■	হ্র	স্ব
ত্ত	■	■	র	■	দ	র
লি	■	জ	ঙ্গ	ম	■	■
কা	ত	ল	■	নি	ঝু	ম
■	■	জ	না	ব	■	ধু
কা	চ	■	লি	■	■	প
শ	ক্র	■	শ	ণ্ডা	ম	র্ক

মজার খেলা

২৪টি কাঠি দিয়েও যেমন হতে পারে এবারের মজার খেলা, না-হলে কাগজের ওপর ছবি এঁকেও খেলাটা দেখানো সম্ভব। খেলা দেখানো মানে তো বন্ধুদের জব্দ-করা সমস্যা দেওয়া। তা, সমস্যার চেহারাটা আগে দ্যাখো। ২৪টা কাঠি সাজাতে হবে এই রকমভাবে—

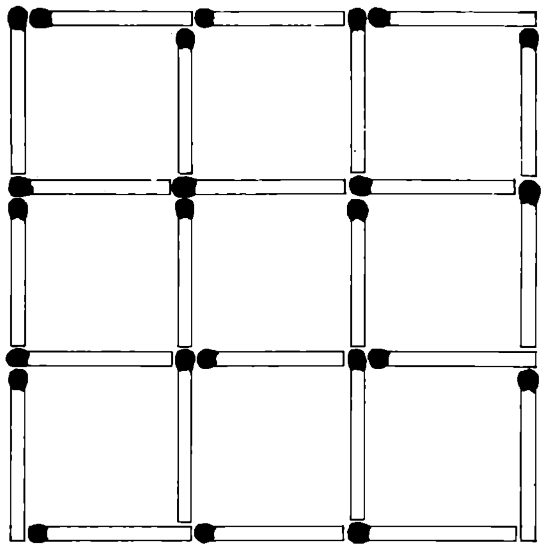

তুমি তৈরি। এবার কোনও বন্ধুকে বলো, এর থেকে আটটা কাঠি এমনভাবে তুলে নিতে হবে, যাতে কিনা পড়ে থাকে মাত্র চারটে বর্গক্ষেত্র।

বন্ধু সরাক। তার আগে তুমি নিজেও চেষ্টা করো। খুব শক্ত কিছু ব্যাপার নয়। সুতরাং, তোমার সমাধান অবশ্যই মিলবে। সব বন্ধু না পারুক, দু-একজন নিশ্চয়ই পারবে। যারা পারবে না, তাদের জন্য শেখানো রইল নীচের উত্তর—

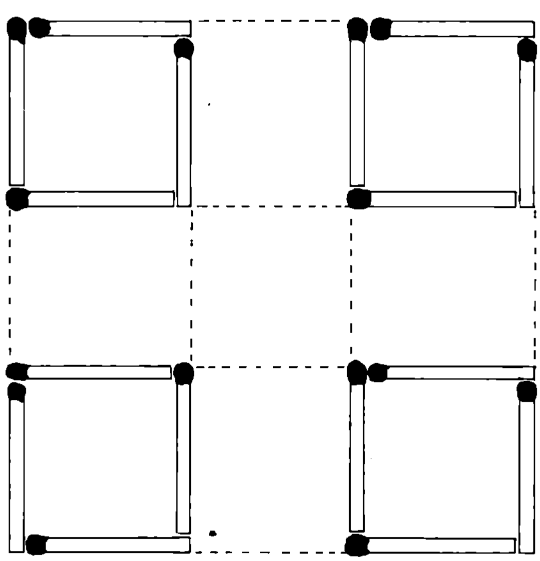

এই উত্তরই তোমার হয়েছে তো?

মজারু

হাসিখুশি

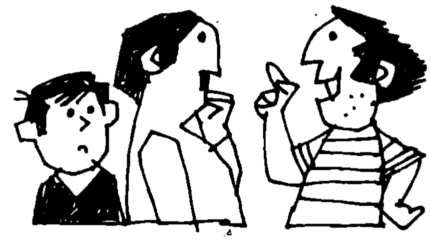

"আমার ছেলের হাতের লেখা খুব খারাপ। কী করা যায় বলুন তো?"

"ওকে ডাক্তারি পড়ান।"

"কী হয়েছে অজয়বাবু? চারতলা থেকে আপনার চিৎকার শুনে নীচে নেমে এলাম।"

"চিৎকার করিনি তো। ছেলেকে ইংরেজি পড়াচ্ছিলাম।"

"চিড়িয়াখানায় অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা অদ্ভুত জানোয়ার এসেছে। দেখতে যাওনি?"

"সে কী! তোমাকে কবে ছেড়ে দিল?"

"খেলতে গিয়ে ওর পায়ে চোট লেগেছে, আপনি ওকে চোখের ওষুধ দিচ্ছেন কেন?"

"দুটো চোখ থেকেও, চোট লাগার আগে সাবধান হতে পারেনি বলে।"

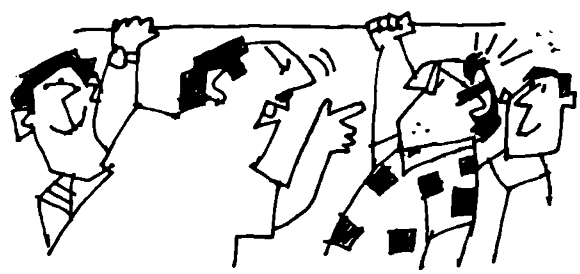

ভিড়ের বাসে এক ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে ফেলে একজন বলে উঠলেন, "সরি!"

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, "সরি-টা কি মন্ত্র যে, আওড়ালেই পায়ের ব্যথা সেরে যাবে?"

"ভদ্রমহিলার মতো অলস আর দুটি নেই। কখনও উনি চা বানিয়ে খান না।"

"কী করে খান তাহলে?"

"চায়ের গুঁড়ো, দুধ, চিনি মুখের মধ্যে নিয়ে গরম জল খেয়ে নেন।"

ফাঁসির পূর্ব-মুহূর্তে দণ্ডিত লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হল, "আপনার কিছু বলার আছে?"

শুকনো হাসি হেসে সে উত্তর দিল, "এই দড়িটি যদি আমার পাওনাদারের গলায় পরিয়ে দেন তো ভাল হয়।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
BRITANNIA
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া
LINTAS BIN MB 11 2720 BG

(সম্পূর্ণ উপন্যাসের শেষাংশ)

ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত

শৈবাল মিত্র

॥ ছয় ॥

রাত আটটার পরেও ঋষিপর্বত জয় করে কেউ ফিরল না দেখে মুনমুন বেশ উতলা হল। আবহাওয়া ভীষণ খারাপ। মাঝে-মাঝে সাবুদানার মতো ঝরঝর করে বরফ পড়ছিল। বরফ-পড়া শেষ হলে শুরু হচ্ছিল বৃষ্টি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল অবিরাম।

দু' একবার মুনমুন প্রশ্ন করল বাবুলালকে, "কী ব্যাপার, ওরা ফিরছে না কেন?"

নিজেকে যা-ই বোঝাক না কেন, সামিটে যেতে না পারায় বাবুলালের মেজাজ সকাল থেকেই খিচড়ে ছিল। মুনমুনকে ওষুধ দিয়ে, হরলিকস খাইয়ে ও চুপচাপ স্লিপিং ব্যাগের ওপর শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ক্যাম্পের জানলা দিয়ে একবার দেখল, প্রদীপ, **ইন্দ্রনাথ** আর অমূল্য শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওঠার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, ওদের গতি খুব আশাপ্রদ নয়। এক সময় তিন বন্ধু বাবুলালের চোখের আড়ালে চলে গেল। দুপুরে বরফ গলিয়ে জল গরম করে, মুনমুনের হাতে সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করে বাবুলাল দু' কাপ হরলিকস বানিয়েছিল। এককাপ নিজের, অন্যটা মুনমুনের। ওই এক কাপ হরলিকস ছাড়া বাবুলাল আর কিছু খেল না। খিদে নেই, মুখে রুচিও নেই। তিন বন্ধু ফিরে না আসা পর্যন্ত ও বোধহয় আর খেতে পারবে না। একবুক উদ্বেগ আর

উত্তেজনা নিয়ে বন্ধুদের ফেরার জন্যে বাবুলাল প্রতীক্ষা করছে। বাবুলালের সেবা আর সারাদিনের বিশ্রামে মুনমুন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

বিকেল ফুরোতেই মুনমুন আর ক্যাম্পের মধ্যে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারল না। বারবার ঘরবার করতে লাগল। সন্ধের পর বাবুলালেরও দুশ্চিন্তা শুরু হল। কিন্তু মুখে সে কিছু বলল না। সঙ্গে দূরবিন নেই। ক্যামেরায় জুম্ লেন্স লাগিয়ে ঋষিপর্বতের চূড়ার দিকে ও বেশ কয়েকবার দেখল। কোথাও কিছু নেই। ধবধবে সাদা বরফের চূড়া আকাশ স্পর্শ করেছে।

একসময় চারপাশে অন্ধকার নামল। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুধু উত্তরঋষি হিমবাহ জুড়ে বরফের ধস নামার আওয়াজ। বাবুলাল বলল মুনমুনকে, "ওরা নিশ্চয়ই কোনও গুহার মধ্যে ডেরা গেড়েছে। সেই গুহায় রাত কাটিয়ে কাল ভোরে সামিটে যাবে।"

মুনমুন শুনল বাবুলালের কথা, কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না।

বাবুলাল প্রশ্ন করল, "তোর হাতের অবস্থা কী ?"

"ভাল," মুনমুন জবাব দিল।

দু'জনে আবার কিছু সময় চুপচাপ মুখামুখি বসে থাকল। রাত নটা বাজার পর সিগন্যালিং গানটা নিয়ে বাবুলাল ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। পূর্ণিমার রাত। চাঁদ না ওঠায় নিকষ কালো অন্ধকার, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সিগন্যালিং গানে কার্টিজ ভরে বাবুলাল ফায়ার করল। জোরালো শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোর টুকরো হাউইয়ের মতো ক্যাম্পের ঠিক ওপরের আকাশে দাউদাউ করে কয়েক সেকেণ্ড জ্বলল। পাহাড়ে, সমুদ্রে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে দলছুট পথভ্রান্ত অভিযাত্রীদের এভাবেই সংকেত পাঠানো হয়। বাবুলাল পরপর দুটো কার্টিজ ফাটিয়েও বন্ধুদের কাছ থেকে কোনও পাল্টা সংকেত পেল না। মুখের দু'পাশে দুটো হাত রেখে, একবুক শ্বাস টেনে বাবুলাল এবার গলা দিয়ে একটা আওয়াজ করল—"হো··· ···ই।"

পাহাড় কাঁপানো এই প্রচণ্ড আওয়াজ শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনি তুলল, হো···ও···ই। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে চারপাশ আবার নীরব, নিঝুম হয়ে গেল। একটা মোমবাতি জ্বেলে ক্যাম্পের জানলার পাশে রেখে দিল বাবুলাল। স্বচ্ছ, সাদা ফাইবার গ্লাসের চাদর ঢাকা জানলা। জানলার বাইরে, অনেক ওপর থেকেও এই মোমের আলো দেখা যাবে। বাবুলাল দেখল হাতঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ও ঠিক করল, রাতে ঘুম ভাঙলে আরও একবার সিগন্যালিং গান নিয়ে ফায়ার করবে।

নিজের স্লিপিং ব্যাগের ওপর মুনমুন চুপ করে বসে ছিল। বাবুলাল বলল, "ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়।"

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে মুনমুন স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আশ্রয় নিল। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বাবুলাল আর একবার সিগন্যালিং গান ফায়ার করল। কিন্তু বৃথা ! কেউ সাড়া দিল না।

খুব ভোরে মুনমুন ডেকে তুলল বাবুলালকে। ক্যাম্পের বাইরে এসে দুজনে দাঁড়াল। কী চমৎকার দিন ! ঝকঝকে নীল আকাশ, সূর্য উঠেছে। ঘন রোদ এসে পড়েছে ক্যাম্পের ওপর। কোনওদিকে এক টুকরো মেঘ নেই। ক্যাম্পের উত্তর থেকে দক্ষিণে বরফে মোড়া সারি-সারি শিখর। সকলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাদেবী। ভোরের আলোয় স্বর্ণাভ হয়ে উঠেছে নন্দাদেবীর মুখ। সপারিষদ নন্দাদেবী ধ্যানে বসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু শ্বেতশুভ্র শিখরের সারি নন্দাদেবীকে ঘিরে আছে। ব্যতিক্রম চ্যাংব্যাং, তার গায়ে বরফের ছিটেফোঁটাও নেই। বাঁ দিকে প্রথম দুনাগিরি, তারপর চ্যাংব্যাং, পাশেই কলঙ্ক, তারপরেই কৃষ্ণশৃঙ্গ, ঋষিপাহাড়।

বাবুলালের পাশে মুনমুনও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভোরের আলোয় উজ্জ্বল, পবিত্র হিমালয়ের এই অপরূপ মূর্তি দেখে সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

সকাল নটা বাজার পরও তিনজনের কেউ শিখর থেকে ফিরল না। আবার প্রতীক্ষা ! বাবুলাল আর মুনমুন সকালে একমুঠো করে ভাজা সুজি খেয়েছে। তারপর এক কাপ করে হরলিকস। মাঝে-মাঝে ছুরির মতো ধারালো বাতাস পোশাক ফুঁড়ে শরীরে কামড় বসালেও ওরা ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল না। ঋষিপাহাড়ের চূড়ার দিকে নজর রেখে ক্যাম্পের সামনে বসল দুজন। পরিষ্কার, নির্মেঘ দিন। শিখরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত কাছে, মনে হচ্ছে, এক দৌড়ে শিখর ছুঁয়ে নেমে আসা যায়। হঠাৎ বাবুলাল বলল, "ওই যে ওরা উঠছে ! শিখরের খুব কাছাকাছি।" মুনমুনও দেখল তিনজনকে, তিনজন মানুষ, পিঁপড়ের চেয়ে সাইজে একটু বড়, গুটিগুটি উঠছে। ক্যামেরার জুম লেন্সে তিন বন্ধুর অনেকগুলো ছবি বাবুলাল তাড়াতাড়ি তুলে নিল। আকাশের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝকঝকে আলো থাকলেও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে একটা ঘন মেঘের দলকে ঋষিপাহাড়ের শিখরের দিকে বাবুলাল এগিয়ে যেতে দেখল। বাবুলাল বুঝল, এই মেঘে একটা কেলেঙ্কারি হবে। তাই হল। মেঘের আড়ালে তিন বন্ধু এবং শিখরটা হারিয়ে গেল।

বেলা বারোটা নাগাদ বাবুলাল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "সামিট জয় করে ওরা ফিরে আসছে।"

মুনমুন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। চাপ-চাপ মেঘের আড়ালে তিনজনের কাউকেই মুনমুন দেখতে পেল না। জুম লাগানো বাবুলালের ক্যামেরাটা নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে মুনমুন দেখতে পেল তিনজনকে। মনে হল, তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। এখনই নেমে আসবে। মুনমুনের অবসাদ, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা নিমেষে কেটে গেল।

আনন্দের চোটে বাবুলাল বলল, "আমার দারুণ খিদে পেয়েছে।"

ক্যাম্পের ভেতরে গিয়ে মুনমুন একটা মাংসের টিন খুলল। তারপর এক টুকরো বরফ ভেঙে জল গরম করতে বসল। মিল্ক পাউডার গুলে পাঁচ কাপ গরম দুধ বানাবে। বাবুলাল আর সে নিজে দু'কাপ খেয়ে বাকি তিন কাপ বন্ধুদের জন্যে ফ্লাস্কে রেখে দেবে।

॥ সাত ॥

অমূল্য একটু ঘুমোলেও প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথের সারারাত তেমন ঘুম হয়নি। মাঝে-মাঝে ইন্দ্রনাথের ঝিমুনি আর সামান্য

তন্দ্রা এসেছে, কিন্তু তন্দ্রার ঘোর বেশিক্ষণ থাকেনি। ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে। গত পঁচিশ দিন ধরে একটানা পাহাড়ে ওঠার নানা স্মৃতি আর ছবি মাথার মধ্যে গজগজ করছে। চোখ বুজলেই মাথার মধ্যে সেগুলো তালগোল পাকায়। তন্দ্রা ভাঙলেই ইন্দ্র বুঝতে পারছিল যে, প্রদীপ জেগে আছে। প্রদীপও ঘুমোয়নি, ঘুমোতে পারছে না, কিছু ভাবছে। কিন্তু অমূল্যর ঘুম ভেঙে যাবে ভেবে ইন্দ্র কথা বলছিল না প্রদীপের সঙ্গে। প্রদীপের অবশ্য কথা বলার কোনও ইচ্ছে নেই। ডানপাশের কানের ব্যথাটা ক্রমশ টাটিয়ে উঠছে। বিষযন্ত্রণা কান থেকে গলা আর মাথার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে ব্যথার ঢেউ অনবরত ফুলে আর মুছে যাচ্ছে। মাথার মধ্যেও কেমন ঝিমঝিম ভাব। কাল সকালে আরও প্রায় হাজার ফুট উঠতে হবে। ভারী বিপন্ন বোধ করল প্রদীপ। একটু ঘুম হলে ব্যথাটা হয়তো কমত। কিন্তু ঘুম আসছে না। ঋষিশৃঙ্গের শিখর জয় না করা পর্যন্ত ঘুম হবে না। কানের ব্যথার জন্যে শিখরে উঠতে হয়তো একটু কষ্ট হবে। তা হোক। এসব জ্বালা, যন্ত্রণাকে এখন গ্রাহ্য করার সময় নেই। শুধু জ্বালা-যন্ত্রণা কেন, শিখরে না ওঠা পর্যন্ত তার মরারও সময় নেই।

কখন যেন রাত শেষ হয়ে গিয়েছিল, ইন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখে বুঝতে পারেনি। তার হাতঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর একটা ঘড়ি ছিল প্রদীপের পকেটে। অমূল্যর শরীরে ঠেস দিয়ে দু'চোখ বুজে বসে থাকা প্রদীপ ঘুমোচ্ছে, না জেগে আছে, ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারল না। বাইরের আকাশের দিকে নজর করেনি। অবিরাম বাতাসে তুষারকণা উড়ছে। কে যেন পিচকিরি করে তিনজনের মুখে একটানা গুঁড়ো তুষার ছুঁড়ে মারছে। সামনে একটা বরফের দেওয়াল। সেটা টপকে একটা ঢালের ওপর দাঁড়াতেই শিখরটা স্পষ্ট দেখা গেল। শিখরের ঠিক নীচেই একটা খাঁজ, একে বলে স্যাডেল। দু' তিন ইঞ্চি গভীর নরম তুষারের ওপর দিয়ে ওঠার গতি কিছুতেই বাড়ানো যাচ্ছে না। অবশেষে তিন অভিযাত্রী শিখরের ওপর এসে দাঁড়াল। জোরালো দক্ষিণ-বাতাস তাদের শরীরের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের অভিনন্দন জানাল। তীক্ষ্ণ, গড়ানে শিখরটার ওপর দাঁড়িয়ে তিনজনই টলমল করছে। কেমন যেন বেসামাল, অনিশ্চিত পদক্ষেপ। প্রবল বাতাস তিনজনকেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। দুটো পতাকা খুলে অমূল্য উবু হয়ে বসে আছে। অমূল্যর পায়ের কাছে প্রদীপ। বাতাসের টানে পতাকার দুটো লাঠি যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। ইন্দ্র ছবি তুলছে পরপর। হরদেওলের পেছন থেকে ত্রিশূলের মূল শিখর উঁকি দিচ্ছে। ক্রমাগত তুষারঝড়ে ঋষিশিখরের চূড়ায় ভাঙাগড়া চলছে। পেছনে, অনেক দূরে নন্দাদেবী মেঘাবৃত। সাফমিনাল আর দুনাগিরিকে পেছনে রেখে খুব তাড়াতাড়ি ইন্দ্র কয়েকটা ছবি তুলল। তিনটি চূড়াই মনে হচ্ছে এক সরল রেখায় আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরঋষি হিমবাহের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র মুগ্ধ হয়ে গেল। দুটো ধারা সাদা এবং কালো পাথরের টুকরোয় তৈরি পাশাপাশি পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছে। ছবি তোলার পাট চটপট শেষ করে বন্ধুদের নিয়ে ইন্দ্র নেমে যেতে চাইছে। এই গড়ানে শিখরের ওপর বেশিক্ষণ থাকা অসম্ভব। তাছাড়া কী এক রহস্যময় ধাঁধায় তার মাথার ভেতরটা ভনভন করছিল। জয়ের আনন্দ না শূন্যতা সে বুঝতে পারল না। বরফে পোঁতা ফ্ল্যাগদুটো ছেড়ে অমূল্য উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের কিন্তু কোনও বিকার নেই। সে একইভাবে বসে আছে। ইন্দ্রনাথ বলল, "এবার ফিরতে হবে।"

প্রদীপ তবু উঠল না। ইন্দ্রনাথ হাত রাখল প্রদীপের কাঁধে। কাঁধে রাখতে গিয়ে ইন্দ্রনাথের হাতটা প্রদীপের কানে একটু ঠেকতেই প্রদীপ ককিয়ে উঠল, "উফ্।" তারপর রাগী চোখে তাকাল ইন্দ্রের দিকে।

অবাক ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে তোমার?"

"কানে ভীষণ ব্যথা," প্রদীপ বলল।

॥ আট ॥

নামার সময়ে প্রদীপ মোটেই সুস্থ বোধ করছিল না। হাওয়ার বেগ একটু কমলেও নিশ্চল মেঘে আকাশ গুম হয়ে আছে। প্রথমে ঝিরঝির করে তুষার পড়ছিল, কিন্তু ঘোড়ার জিনের মতো সেই স্যাডেলটা পেরোতেই প্রচণ্ড বেগে তুষারপাত শুরু হল। দড়ির সামনে এখন ইন্দ্রনাথ, মাঝখানে প্রদীপ এবং সবশেষে অমূল্য। প্রবল তুষারপাতের সঙ্গে শুরু

আহ্, কি দারুণ অনুভূতি!
PONDS
Pond's
Dreamflower Soap
তরতাজা থাকার অনুপম
সুখানুভূতির মুহূর্তগুলি
আবেশঘন হয় নতুন পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান মেখে
স্নানের পরে...এ যে তাজা
ফুলের সুগন্ধে ভরপুর। আহ্ কি
দারুণ অনুভূতি!
নতুন
পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান
OBM 8682 BEN

হল শাঁইশাঁই হাওয়া। এক সময় ওরা গতরাতের সেই গুহাটার ঠিক মাথার ওপর একটা বরফের পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়াল। চারপাশে বরফের সীমাহীন মহাসমুদ্র। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

প্রদীপ বলল, "একটু বিশ্রাম না করে আমি আর নামতে পারব না।"

প্রদীপের নামার ভঙ্গি এবং মুখচোখের অবস্থা দেখে ইন্দ্র এবং অমূল্য দুজনেই বেশ ভয় পেয়েছিল। প্রদীপের মুখে শুধু অসুস্থতা নয়, আরও যেন কিসের ছাপ পড়েছে। ঋষিপাহাড় জয়ের আনন্দে গোটা পৃথিবী এবং জীবন যেন মূল্যহীন হয়ে গেছে। নামার ব্যাপারটা যেন আর তার মাথাতেই নেই। অথবা থাকলেও সেটা খুব জরুরি নয়। এটা উচ্চতাজনিত এক রোগ। এর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে খুব অসুবিধে। অমূল্য বলল, "গুহা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি; তোমরা ধীরেসুস্থে এসো।"

ইন্দ্রনাথ বলল, "ঠিক আছে।"

ওরা দুজনেই প্রদীপকে একটু বিশ্রাম দিতে চাইল। নাইলনের দড়ি থেকে নিজেকে খুলে অমূল্য চলে গেল গুহার দিকে। মিনিট-পাঁচেক বিশ্রাম করার পরেও প্রদীপ উঠল না। ইন্দ্রর প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পেছনে বরফের ওপর প্রদীপ একইভাবে বসে থাকল।

"কী হল? ওঠো," ইন্দ্রনাথ বলল প্রদীপকে।

শূন্য, ফাঁকা দৃষ্টিতে প্রদীপ তাকাল ইন্দ্রনাথের দিকে। ইন্দ্র দেখল প্রদীপের দু'চোখের জমি কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। প্রদীপ বলল, "নামা কী খুব দরকার?"

প্রশ্ন শুনে ইন্দ্রনাথ হতবাক হয়ে গেল। প্রদীপ আবার নিজের মনেই কী যেন বিড়বিড় করছে। সেই নির্জন পার্বত্যভূমিতে প্রদীপের জড়ানো কথাগুলো ইন্দ্রনাথ শুনতে পেল। লাইনদুটো রবীন্দ্রনাথের, প্রদীপের ডায়েরিতে লেখা আছে।

"আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো,
এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে।"

"কী হয়েছে তোমার?" ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল।

"কানে বড় ব্যথা।"

কথাটা বলতে বলতে বরফের ওপর প্রদীপ প্রায় শুয়ে পড়ল। খানিকটা আতঙ্কিত হয়েই ইন্দ্রনাথ উঠে এসে প্রদীপের পাশে উবু হয়ে বসল। প্রদীপের মাথাটা নিজের কোলে এনে রাখল। প্রদীপের জ্যাকেটের কলারের মধ্য দিয়ে ভেতরে তুষার ঢুকছে। তুষারকণাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিচ্ছে ইন্দ্রনাথ। প্রদীপের মুখে যাতে না বরফ পড়ে, সেজন্যে তার মুখটা ইন্দ্রনাথ মাটির দিকে রেখেছে। আরও প্রায় দেড় হাজার ফুট নামতে হবে। অসুস্থ, ক্লান্ত প্রদীপকে চাঙ্গা করার জন্য ইন্দ্রনাথ একতরফা কথা বলতে লাগল। বলল, "তুমি কেমন লিডার, গাছে তুলে আমাদের মই কেড়ে নিচ্ছ? আমি কিন্তু কলকাতায় ফিরে সব বলে দেব।"

ইন্দ্রের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে প্রদীপ শুয়ে আছে। এত বিদ্রূপেও সে চোখ খুলে তাকাতে পারছে না।

তুষার পড়ার বিরাম নেই। এই তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব, সময়েরও অপচয়। অমূল্য নিশ্চয়ই গুহার সামনে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। গুহার সামনে অপেক্ষা না করলেও একটু বাঁ দিকে নামার রাস্তার ওপরেই হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রদীপের মুখ দেখে ইন্দ্রের মনে হল, প্রদীপ এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। খানিকটা ব্যস্ত হয়েই প্রদীপের জ্যাকেটের কলার ধরে ইন্দ্রনাথ একটা দারুণ ঝাঁকানি দিল।

"উফ্, কানে ব্যথা," প্রদীপ চোখ মেলে বলল।

"তুমি এখনই উঠে না দাঁড়ালে আমি কিন্তু তোমার ওই কানটাই মলে দেব।" ইন্দ্র বলল।

এ-কথায় দু'চোখ স্পষ্ট করে মেলে প্রদীপ তাকাল অমূল্যর দিকে। তারপর প্রদীপ বিড়বিড় করল, "আমার কিন্তু সব মনে থাকবে।"

ইন্দ্র বুঝল, তার খোঁচাতে কাজ হয়েছে। প্রদীপকে আরও একটু উত্তেজিত করার জন্যে ইন্দ্রনাথ বলল, "তোমার মনে রাখার আমি পরোয়া করি না। আগে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর তোমার কেরামতি দেখাবে।"

প্রদীপ আস্তে আস্তে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের পিঠ চাপড়ে আনন্দে ইন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার লিডার।"

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই প্রদীপকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ সেই গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। নরম তুষারের ওপর অমূল্যর পায়ের ছাপ। গুহার ভেতরে ঢোকার এবং বেরিয়ে যাওয়ার দু'জোড়া দাগ দুমুখো পাশাপাশি পড়েছে। টাটকা পদচিহ্ন। দেখেই ইন্দ্রনাথ বুঝল যে, তাদের জন্যে কিছু সময় অপেক্ষা করে অমূল্য নেমে গেছে। খুবই স্বাভাবিক। এই নির্জন পাহাড়ে একজন মানুষ একা-একা বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারে না। তাদের দেরি দেখে হয়তো অমূল্য ভেবেছে, ওর আগেই বন্ধুরা নেমে গেছে। ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারল আরো কঠিন, বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি তাকে হতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পা ফেলা দরকার। একপলক পেছনে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ ধরতে পারল, প্রদীপ এখনও সমান অসুস্থ। তার মুখের রঙ রক্তহীন ফ্যাকাসে, দু'চোখে সেই বিভোল দৃষ্টি। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতেও প্রদীপের যেন বেশ কষ্ট হচ্ছে। ইন্দ্রনাথ দেখল, গুহাতে আসার পথে কখন যে প্রদীপের বাঁ হাতের দস্তানাটা খসে গেছে, সেটা প্রদীপের খেয়াল নেই। বরফ কাটার গাঁইতিটা ডান হাতে ধরে প্রদীপ তাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে। কাছে গিয়ে ইন্দ্র দেখল, প্রদীপের বাঁ হাতটা তুষার আর হাওয়ায় শক্ত, অসাড় হয়ে গেছে। পকেটে রাখা একটা বাড়তি হাতমোজা ইন্দ্রনাথ পরিয়ে দিল প্রদীপকে।

প্রদীপ বলল, "আমি একটু ঘুমোতে চাই। একটু ঘুমোলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"

ইন্দ্রনাথ এক পলক প্রদীপকে দেখে বলল, "এখানে কোথায় ঘুমোবে? একটা কেরোসিন কেক নেই, স্টোভ নেই। চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও, দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ নম্বরে পৌঁছে যাব।"

খুব সন্তর্পণে, ধীরে-ধীরে ওরা নামতে শুরু করল। সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। এরকমভাবে নামলে আজ রাতে এই বরফের রাজত্বে কাটাতে হবে। প্রদীপ মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে। প্রদীপের একপাটি জুতোর ক্র্যাম্পঅন খুলে গেল। অনেকবার ইন্দ্র অনুরোধ করার পরেও প্রদীপ সেটা জুতোয় লাগাল না। বরফের ওপর থেকে ক্র্যাম্পঅনটা তুলে ইন্দ্র

নিজের পকেটে রাখল।

প্রদীপ প্রশ্ন করল ইন্দ্রকে," তোর সেই লাইনটা মনে আছে?"

"কোন্ লাইনটা ?"

বিড়বিড় করে প্রদীপ বলল, "Death is not too high a price to pay for a life fully lived"

ইন্দ্র বলল, "তোমার ডায়েরিতে পড়েছি।"

কী যেন ভাবতে ভাবতে প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রদীপকে উত্তেজিত, সজাগ রাখার জন্যে ইন্দ্র একলাই বকে যাচ্ছে, "তুমি একজন ভেটারান ক্লাইম্বার, তোমার সুনাম বজায় রাখতে হবে। এভারেস্টের প্র্যাকটিস ক্যাম্পে তোমায় ডেকেছে, এটা কম কথা নয়।"

প্রদীপ কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে পড়লেই দড়িতে টান পড়ায় ইন্দ্রনাথের গতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ তখন কিছু গা-জ্বালানো মন্তব্য করছে। "হেলিকপটারে চেপে তোমার আসা উচিত ছিল।"

কিন্তু কোনও বিদ্রূপ বা অপমান প্রদীপের গায়ে লাগছে না। ইন্দ্রনাথ চাইছিল, প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, পর্বতপ্রেমিক তার এই বন্ধুটি রেগে যাক, খেপে উঠুক, তাকে গাল দিক, মারতে আসুক। কিন্তু প্রদীপ কিছুই করছে না। ইন্দ্রনাথ বড় অসহায়, একা বোধ করল। ভাবল, অমূল্য সঙ্গে থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু তা আর হবার নয়।

॥ নয় ॥

বেলা বারোটা নাগাদ পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে বাবুলাল সেই যে তিন বন্ধুকে নামতে দেখেছিল, সেই শেষ। তারপর অনেকবার চেষ্টা করেও ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে তাদের দেখতে পায়নি। বাবুলাল বুঝতে পারছিল যে, শিখরজয়ীদের নামার গতি সন্তোষজনক নয়। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। বাবুলাল খানিকটা উদ্বিগ্ন হল। ঋষিপাহাড়ের সাদা পিচ্ছিল দেওয়ালটা মাঝে-মাঝে মেঘ, কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, আবার আলো জাগছে। সকালের মতো পরিষ্কার, উজ্জ্বল নয়, ফ্যাকাসে, ম্লান আলো। ক্যাম্পের সামনে বেশ কয়েকবার তুষারঝড় হয়ে গেছে। দুপুর শেষ হওয়ার পর হঠাৎ ক্যামেরার লেন্সে একজনকে দেখতে পেল বাবুলাল। কী ব্যাপার ? একজন কেন ? আর দুজন কোথায় ? শিখর থেকে তো তিনজনকেই ফিরতে দেখেছিল সে। দেখেছিল দু'হাজার ফুট ওপরে। পাহাড়ের চূড়ায় এই দূরত্বও অনেক। নামতে নামতে এক জায়গায় তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ছিল। চুপচাপ অনেকক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। দেখে বাবুলালের মনে হয়েছিল, ওখানে কোনো গুহা বা ঢল আছে। একটু পরে একজন এগিয়ে এসেছিল, বাকি দুজন আরো কিছু পরে একটা বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে শুধু একজনকে ফিরতে দেখছে। ভাল করে নজর বোলাতে বাবুলাল চিনতে পারল অমূল্যকে। বাবুলালের পাশে বসে মুনমুন ফিসফিস করল, "মনে হচ্ছে অমূল্যদা।"

নেমে আসা মানুষটাকে ঠিকঠাক চিনতে না পারলেও মুনমুন দেখতে পাচ্ছিল। তার কথায় সায় দিয়ে বাবুলাল বলল, "হ্যাঁ, অমূল্য।"

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে মুনমুন প্রশ্ন করল, "প্রদীপদা আর ইন্দ্রদা গেল কোথায় ?"

এ-প্রশ্ন বাবুলালেরও। তাই সে কোনও জবাব দিল না। বাবুলাল দেখল, অমূল্যকে এখনও পাঁচশো ফুট নামতে হবে। কিন্তু এ কী করছে অমূল্য ? পুরনো পথ না ধরে সে আড়াআড়ি এগিয়ে আসছে। ফলে সোজা ক্যাম্পের দিকে আসার বদলে অমূল্য ক্রমশই ডানদিকে সরে যাচ্ছে। অমূল্যকে নামতে দেখে তার জন্যে কমপ্ল্যান বানাল বাবুলাল। মুনমুন তখনও ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে অমূল্যকে দেখছে। বাবুলাল দেখল, অমূল্য আরও শ'খানেক ফুট নেমে এসেছে। ক্যাম্পের ডান দিকে আর বিশেষ সরেনি। একটা শক্ত বরফের বিশাল টিলার সামনে অমূল্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বরফের টিলাটা নীচ থেকে দেখে বাবুলাল বুঝতে পারল যে, এই টিলা বেয়ে অমূল্য একা নামতে পারবে না। লোহার মতো কঠিন এই বরফখণ্ড মৃত্যুফাঁদ। এর ওপর পা দিলে নিমেষে অমূল্য পিছলে যাবে। দু'হাত নেড়ে সামান্য বাঁ দিকে সরে আসার জন্যে বাবুলাল পাগলের মতো সংকেত দিতে থাকল অমূল্যকে। কিন্তু বাবুলালের হাতের ইশারা, সংকেত, কিছুই খেয়াল করল না অমূল্য। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের মাথায় ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ থাকার জন্যে অমূল্য হয়তো দেখতেই পেল না বাবুলালকে। বাবুলাল দেখল, সেই বরফের টিলার সাদা, শক্ত দেওয়ালের ওপরই অমূল্য পা রাখল। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পিছলে গেল সে। বরফের দেওয়ালের গা ঘেঁসে প্রথমে কোমরে ভর দিয়ে, পরে লাট্টুর মতো ঘুরে ঘুরে অমূল্যকে পড়তে দেখল বাবুলাল। তার হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল। কানের পাশে একটা আবছা ভয়ার্ত স্বর শুনতে পেল। অমূল্যর পড়াটা মুনমুনও দেখেছে। সেই ভয়ঙ্কর বরফের টিলাটার দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দু'জনে চুপচাপ বসে থাকল। মনে মনে বাবুলাল বলল, 'ওঠ, উঠে দাঁড়া অমূল্য।' বোধহয় মিনিট দুই-তিন পেরিয়েছে, হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ক্যাম্পের দুশো ফুট ওপরে বরফ-ঢাকা একটা শিখরের ওপরে অমূল্যকে আবার দেখতে পেল ওরা। গলা ছেড়ে বাবুলাল চেঁচিয়ে উঠল, "অমূল্য—"

একটু পরেই অমূল্যকে ধরে বাবুলাল ক্যাম্পে ঢোকাল বরফের কামড়ে অমূল্যর দু'পা, হাতের আঙুল ক্ষতবিক্ষত অমূল্যকে কমপ্ল্যান আর ওষুধ খাওয়াবার পর অমূল্য একটু স্বাভাবিক হল। বলল, গুহা থেকে মালপত্র নিয়ে প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথকে অনেক খুঁজে, নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডেকে, কোনো হদিস পায়নি। শয্যাশায়ী অমূল্যর শরীরের ওপর কয়েকটা স্লিপিং ব্যাগ চাপিয়ে বাবুলাল আবার ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়াল। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে ওপরের দিকে তাকিয়েই বাবুলাল এবার প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথকে দেখতে পেল। প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথ মূল রুট ছেড়ে অমূল্যর চেয়ে আরো বেশি ডান দিকে সরে গেছে। বেশি নামতে পারেনি।

আকাশ না দেখেও বাবুলাল বুঝতে পারল, দিন শেষ হয়ে আসছে। এখনই অন্ধকার নামবে। চাঁদ না উঠলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে এই শক্ত, খাড়া বরফের দেওয়াল ভেঙে ওদের নামা খুব মুশকিল হবে। ভারী দুশ্চিন্তা হল বাবুলালের। ক্যাম্পের ভেতরে মুনমুন আহত অমূল্যর পাশে বসে আছে। মূল রুটের কাছাকাছি সামান্য বাঁ দিকে ইন্দ্রনাথ আর প্রদীপ সরে এল। সেখানে একটা বরফের খাঁজ। বাবুলাল আর দেখতে পেল না দুজনকে।

॥ দশ ॥

প্রদীপের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যে যতটা সম্ভব নরম তুষারের ওপর দিয়ে ইন্দ্রনাথ হাঁটছিল। শক্ত বরফ দেখলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল প্রদীপ। হঠাৎ ইন্দ্রনাথ লক্ষ করল প্রদীপের হাতের আইস অ্যাক্সটা নেই। একটু নজর চালিয়ে ইন্দ্রনাথ আবিষ্কার করল, প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে বরফের গায়ে আইস অ্যাক্সটা ঝুলছে। বরফে গাঁথার পর সেটা তুলে আনতে প্রদীপ ভুলে গেছে। তখন সন্ধে হচ্ছে। বরফের ঢল বেয়ে কুড়ি ফুট উঠে আইস অ্যাক্সটা এনে ইন্দ্রনাথ দিল প্রদীপকে। আইস অ্যাক্স হাতে কয়েক পা এগিয়েই প্রদীপ পিছলে গেল। একটা মস্ত ঝাঁকুনি খেয়ে পরিস্থিতিটা সামাল দিল ইন্দ্রনাথ। হঠাৎ প্রদীপ ডাকল ইন্দ্রনাথকে। ইন্দ্রনাথ বলল, "তুমি এসো আমার কাছে।" পাহাড় থেকে নামার সময় এটাই নিয়ম। ওপরের জন নীচের জনের কাছে আসে। প্রদীপ কিন্তু এল না। দড়ি ধরে ইন্দ্রকে টানতে খানিকটা অবাক হয়েই ইন্দ্রনাথ উঠে গেল প্রদীপের কাছে।

প্রদীপ বলল, "কানে দারুণ ব্যথা।"

ইন্দ্রনাথ বুঝল, প্রদীপ ভুল বকছে। ইন্দ্র নিজের জায়গায় ফিরে এল। কয়েক ফুট নামার পর আবার পিছলে গেল প্রদীপ। ইন্দ্রনাথ বুঝল এভাবে এগোলে বিপদ হবে। প্রদীপকে সামনে দিয়ে সে পেছনে থাকবে। পেছন থেকে দড়ি ধরে দুর্ঘটনা আটকানো অনেক সহজ। প্রদীপকে সামনে পাঠিয়ে ইন্দ্রনাথ পেছনে চলে এল। অমূল্যর ফেলে যাওয়া দড়ির প্রান্তটা বাঁধল নিজের কোমরে। দড়ির সামনের অংশটা প্রদীপের পাশে সাপের মতো লোটাতে থাকল। এতক্ষণে ইন্দ্রনাথ খানিক নিশ্চিন্ত হল। পাহাড় থেকে নামার সময় এটাই নিয়ম। সহযাত্রী কেউ অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে দড়ি ছাড়তে হয়। প্রদীপের নামার ভঙ্গি দেখে ইন্দ্রনাথ ভয় পাচ্ছে। প্রদীপ নামছে না, প্রতিটা ধাপ যেন হড়কে যাচ্ছে। চারপাশে ঘন হচ্ছে অন্ধকার। চোখের সামনে বরফের জগৎ আবছা হয়ে আসছে। ধীর গতিতে আরও কিছুটা নামার পর ঘন অন্ধকারে ঋষিপাহাড় ডুবে গেল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার পরের রাত হলেও মেঘের দরুন চাঁদের আলো খুব কম।

হঠাৎ প্রদীপ থমকে দাঁড়াতে ইন্দ্র প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপার ?"

"সামনে একটা শক্ত বরফের খাদ," প্রদীপ জানাল।

ইন্দ্র বলল, "একটু ডান দিকে সরে যাও।"

প্রদীপ ডান দিকে সরার চেষ্টা করে পারল না। আবছা আলোয় প্রদীপের অসুবিধেটা ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারছে না। ইন্দ্রনাথ আবার ডান দিকে সরে যেতে বলায় প্রদীপ বলল, "পারছি না।"

প্রদীপের কথা শুনে ইন্দ্রনাথ বেশ অবাক হল। খুব সহজ পায়ে বিশ-ত্রিশ ফুট দূরে খাদটার কাছাকাছি প্রদীপ নেমে গেছে। কোনও অসুবিধে হয়নি। ডান দিকে যথেষ্ট জায়গা আছে। তবু প্রদীপ সরতে পারছে না কেন ?

বরফে পোঁতা আইস অ্যাক্সের সঙ্গে লাগানো দড়িটা প্রদীপের কোমর পর্যন্ত আলগাভাবে পড়ে আছে। অ্যাক্সের পাশে বাড়তি দড়িটা ইন্দ্র কুণ্ডলী করে গুটিয়ে রেখেছে।

কী করা যায় ইন্দ্রনাথ ভাবতে থাকল। দুজন মানুষ কোমরে দড়ি লাগিয়ে স্থির, নিঃশব্দ। ইন্দ্রনাথ বলল, "তুমি আমার কাছে ফিরে এসো।"

প্রদীপ নড়ল না। ইন্দ্রনাথ আবার ডাকতে প্রদীপ বলল, "পারছি না।"

নিজের কোমরে আঁটা দড়ির প্রান্তটা খুলে প্রদীপকে পাঠালে হয়তো কিছুটা লাভ হতে পারে, ইন্দ্রনাথ ভাবল, আইস অ্যাক্সের দড়িটা একইভাবে রেখে দড়ির অপর প্রান্তটা প্রদীপের কোমরে বেঁধে দিলে দু'দিকের বাঁধনে প্রদীপ ভরসা পাবে। তখন হয়তো ও নিজেই হেঁটে উঠে আসবে। আসলে এই মুহূর্তে ওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনাটাই জরুরি কাজ।

পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে পরপর দু'বার আলো-বন্দুকের সংকেত এল। ইন্দ্রনাথ বুঝল, বাবুলাল অন্ধকারে পথের সংকেত দিচ্ছে। পাঁচ নম্বর ক্যাম্প তাহলে আর বেশি দূরে নয়। মুখের দু'পাশে হাত রেখে ইন্দ্রনাথ আওয়াজ দিল, "ও...হো ।"

প্রত্যুত্তরে বাবুলাল একই আওয়াজ দিল। ওপর ও নীচের সেই ওহো-ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাজতে থাকল। একটু পরে বাবুলাল আবার আওয়াজ দিতে ইন্দ্রনাথ প্রদীপকে বলল, "সাড়া দাও।"

প্রদীপ নিঃশব্দ, কোনো উত্তর দিল না।

ইন্দ্রনাথ আবার বলল, "প্রদীপ, ওরা খুঁজছে আমাদের। জানান দাও।"

প্রদীপ একই রকম, নির্বিকার, নিঃশব্দ।

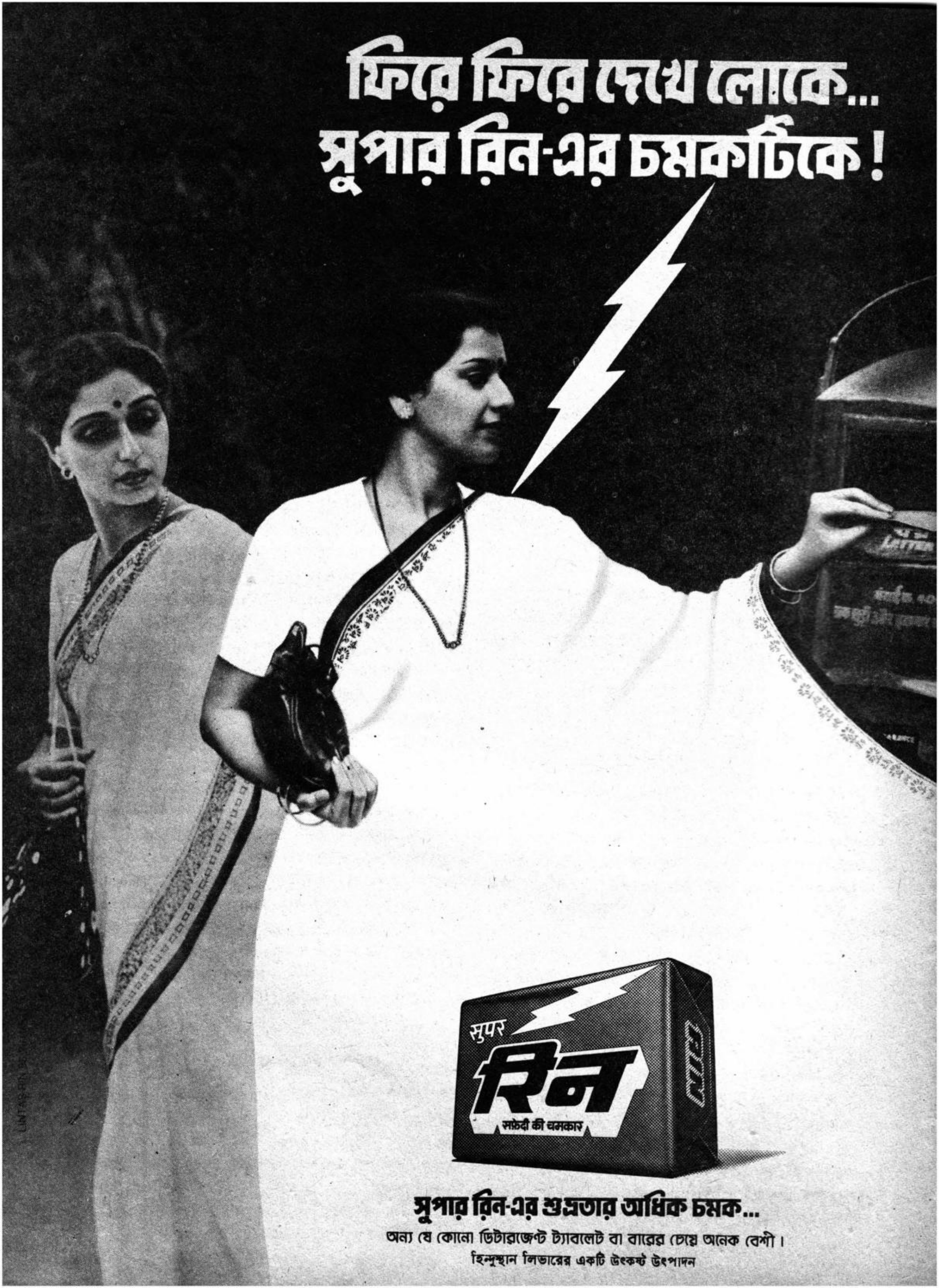

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমৎকারিত্বকে!
सुपर
रिन
सफ़ेदी की चमकार
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী।
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বাধ্য হয়ে ইন্দ্রনাথ নিজেই সাড়া দিল। তুষারপাত আর হাওয়া কমে যেতেই আকাশের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। চাঁদের আলোয় স্বচ্ছ হয়ে উঠল চারপাশ। বিস্তীর্ণ বরফের আয়নার বুকে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে পর্বতের পৃথিবী আরো দৃশ্যমান হয়ে উঠল। পাহাড়ি খাড়াই-এর সামনে প্রদীপ থমকে দাঁড়াবার পর প্রায় দশ মিনিট কেটে গেছে। দুজনেই যেন পাথর হয়ে গেছে। একটু আগে ভাবা পরিকল্পনাটা কাজে লাগাবার জন্যে নিজের কোমরের দড়িটা ইন্দ্রনাথ খুলে ফেলল। দড়িটা একটা অ্যালুমিনিয়মের সেফটি রিং দিয়ে কোমরে লাগানো থাকে। চাবির রিং-এর মতো এই রিংটাকে বলে, ক্যারাবিনার।

রিংসুদ্ধ দড়ির প্রান্তটা প্রদীপের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, "এটা ধরো।"

দু'বার ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয়বারের চেষ্টায় প্রদীপ সেটা ধরতে পারল। চাঁদের আলোয় প্রদীপকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বেশ সহজভাবেই ঢলটার সামনে দাঁড়িয়েছিল প্রদীপ। রিং সহ দড়ির প্রান্তটা প্রদীপ ধরার পর ইন্দ্রনাথ বলল, "রিংটা কোমরে লাগিয়ে নাও।"

রিংটা অনেকটা সেফটিপিনের মতো, দু'আঙুলে চেপে রিং-এর মুখের স্প্রিং-লাগানো জোড়টা খুলতে হয়। কয়েকবার চেষ্টা করেও রিং-এর মুখটা প্রদীপ খুলতে পারল না। প্রদীপের নিষ্ফল চেষ্টা ইন্দ্রনাথ দেখতে পাচ্ছিল। বলল, "আর একবার চেষ্টা করো।"

"পারছি না," প্রদীপ জানাল।

"নিশ্চয়ই পারবে।"

"আমার হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। জোর নেই।"

প্রদীপের জবাব শুনে ইন্দ্রনাথ শব্দহীন হয়ে গেল।

কিছু সময় নীরবতা, দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

প্রদীপ বলল, "ইন্দ্র, একটু সাহায্য করো আমাকে।"

"কী সাহায্য," ইন্দ্রনাথ জানতে চাইল।

"যে-কোনো সাহায্য, একটু সাহায্য পেলেই আমি ফিরতে পারব।"

ইন্দ্র বুঝল, আইস অ্যাক্সের দড়ি ধরে প্রদীপকে টেনে তুলতে হবে। আর কোনও উপায় নেই। নাইলনের দড়ির দুটো প্রান্তই প্রদীপের কাছে, মাঝখানে ইন্দ্রনাথ। আর একটা বাড়তি দড়ি থাকলে ভাল হত। কিন্তু নেই। আইস অ্যাক্সে লাগানো দড়ির মাঝখানটা জুতোর ক্র্যাম্পঅন দিয়ে চেপে ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে। নিচু হয়ে জুতো সরিয়ে ইন্দ্রনাথ দড়িটা ধরতে গেল। ডান হাতের দুটো আঙুলে ইন্দ্র দড়িটা স্পর্শ করল। নিছক স্পর্শমাত্র, ধরতে পারল না দড়িটা। তার আগেই বরফে পোঁতা আইস অ্যাক্সটা ছিটকে গেল। ইন্দ্রনাথ দেখল, হাতের কাছে দড়িটা নেই। সাদা বরফের খাড়া দেওয়াল দিয়ে দড়িটা নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শুধু দড়ি নয়, গড়িয়ে পড়ছে আইস অ্যাক্সটাও। সাদা বরফের ওপর দিয়ে দ্রুত নামতে থাকা দড়ির প্রান্তে প্রদীপ। প্রদীপ তলিয়ে যাচ্ছে। পিচ্ছিল, খাড়া বরফের ঢলের ওপর শরীরের দু'পাশে দু'হাত রেখে প্রদীপ বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন এক শিশু পার্কে স্লিপ চড়ছে। যত নীচে নামছে, তত বেড়ে যাচ্ছে গতি। ক্রমশ প্রদীপের শরীরটা একটা কালো বিন্দু হয়ে নীচে, অনেক নীচে মিলিয়ে গেল।

ইন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি, কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। অসাড়, শূন্য মাথায় অতলস্পর্শী খাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু আয়নার মতো কঠিন বরফ আর ধুধু নীরবতা। একসময় তার সংবিৎ ফিরে এল। গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল, "প্রদীপ…লিডার…।"

নিশ্চল বরফতরঙ্গে তার গলা ঘুরে ঘুরে প্রতিধ্বনিত হল। কেউ সাড়া দিল না। বরফের সেই দেওয়ালের ওপর ইন্দ্রনাথ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। মাথা ঝিমঝিম করছে, মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না কিছু। চারপাশে ফ্যাকাসে অন্ধকার। মেঘভাঙা চাঁদের আলোয় চকচকে সাদা বরফের ঢলগুলো দেখা যাচ্ছে। অনেকটা সময় আগে বেসক্যাম্পের আলোটা ইন্দ্রনাথ দেখেছিল। এখন সেখানেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চাঁদ ওঠার পরেও টর্চ জ্বেলে বাবুলাল কয়েকবার সংকেত পাঠিয়েছে। টর্চের আলোও আর জ্বলছে না। বাবুলাল আর মুনমুন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ইন্দ্রনাথ হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ আবার উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল, কাঁদলে বা ভেঙে পড়লে চলবে না। বেসক্যাম্পে আমাকে পৌঁছোতেই হবে।

নিজের অবস্থাটা ইন্দ্রনাথ বোঝার চেষ্টা করল। গাঁইতি নেই, দড়ি নেই, খালি হাতে কঠিন বরফের এই খাড়াই দেওয়াল বেয়ে তাকে নামতে হবে। তখনই তার মনে পড়ল, প্রদীপের জুতোর ক্র্যাম্পঅনটার কথা। অনেক অনুরোধেও কাঁটাটা প্রদীপ যখন জুতোয় লাগাল না, তখন ইন্দ্রনাথ নিজের পকেটে সেটা রেখেছিল। হ্যাঁ, পকেটেই সেটা আছে। ক্র্যাম্পঅনটা হাতে নিয়ে শক্ত বরফ এড়িয়ে নরম তুষার খুঁজে ইন্দ্রনাথ আবার নামতে শুরু করল। সামিটে চড়ার সময় স্নো গ্লাস পরে পাওয়ার লাগানো চশমাটা ইন্দ্রনাথ পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে রেখে এসেছিল। এখন প্রতি পদক্ষেপে সেই চশমাটার অভাব ইন্দ্র টের পেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ভাল করে। একটা জায়গায় পৌঁছে ইন্দ্রনাথের মনে হল, ঠিক তার পায়ের নীচেই বেসক্যাম্প। মই বেয়ে নামার মতো হাতের কাঁটাটা বরফের দেওয়ালে গেঁথে ধীর চালে সে নামছে। হঠাৎ তার পা পিছলে গেল। হাতের কাঁটাটা বরফে আটকে ইন্দ্রনাথ পড়াটা ঠেকাতে চাইল। কিন্তু পারল না। এতক্ষণ বরফের দিকে মুখ করে সে নামছিল। পড়ার সময় পর্বতারোহীর সহজাত শিক্ষায় সে শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। এখন বরফের ওপর তার পিঠ, মুখটা আকাশের দিকে। দু'পায়ের জুতো আর হাতের কাঁটা দিয়ে ইন্দ্রনাথ আরো কয়েকবার বরফের দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। দু'পায়ের মাঝখানে নরম তুষার জমছে। হাতের কাঁটাটা হঠাৎ ছিটকে পড়ে গেল। ইন্দ্রনাথ দেখল, আকাশের চাঁদ ধীর, স্থির, শান্ত, তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় দেড়-দু'শো ফুট পড়ার পর নরম তুষারস্তূপে তার শরীরটা আটকে গেল। ও ভাবতে চাইল, এখন কত রাত? আকাশভর্তি তারা আর চাঁদের দিকে একপলক তাকাল। মনে মনে হিসেব করল, এখান থেকে বেসক্যাম্প খুব দূরে নয়। আবার চেষ্টা করতে হবে। ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়াল।

রাতের শীতল অন্ধকারে চারপাশের বরফ শক্ত হয়ে আছে। দিনের বেলায় এমন হয় না। সূর্য উঠলে, রোদ

পড়লে, বহু বছর ধরে জমে থাকা পাথরের মতো কঠিন বরফস্তরও নরম, গলা-গলা হয়ে ওঠে। কিন্তু রাতের বেলায় আবার জমাট বেঁধে যায়। সতর্ক পায়ে সেই কঠিন বরফের ওপর দিয়ে আন্দাজে একপা এগোতেই ইন্দ্রনাথ আবার পিছলে গেল। বরফের খাড়া দেওয়াল দিয়ে তার শরীরটা ঘুরপাক খেয়ে নামতে থাকল।

॥ এগারো ॥

রাতের অন্ধকারে কতক্ষণ যে বেহুঁশ ছিল, ইন্দ্রনাথ জানে না। জ্ঞান ফিরতে বুঝল যে, কোনও একটা বরফের খাঁজে তার শরীরটা আটকে আছে। প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে বরফে। একটা হাত বরফের ভেতর, অন্যটা বাইরে। মাথার কোষগুলো সব মরে গেছে, আচ্ছন্ন, বিভোর। ইন্দ্রনাথের মনে হল, দূর বিদেশে, কোনো একটা জায়গায় সে খেলতে গেছে। খেলার মাঠের চারপাশে বরফ পড়েছে। মাঠে আসার পথে একটা বরফের নালায় সে পড়ে গেছে, উঠতে পারছে না। সে চেঁচাল, "আমাকে বাঁচাও।"

চারপাশে অনেক মানুষ। কিন্তু তার ডাক শুনে কেউ তাকে বাঁচাতে এল না। বড় অবাক হল ইন্দ্রনাথ। চোখ মেলে তাকাতেই একঝলক ঘন, উষ্ণ রোদ দেখতে পেল। রোদের তাপেই হয়তো তার মাথা আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। হুঁশ ফিরে পেল সে। ফিরে পেয়েই বুঝল, সে মরতে বসেছে, সামনে অবধারিত মৃত্যু, নিজেকে নিজে না বাঁচালে এই বরফসমাধি থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে আসবে না। অদম্য মনোবলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে দেখল, কঠিন বরফে দুটো পা আটকে গেছে। ডান হাতে বরফ সরাতে গিয়ে বুঝল, সারারাত বরফের ওপর থাকার জন্যে হাতটা অকেজো হয়ে গেছে। বাঁ হাত দিয়ে পায়ের নীচের বরফও খোঁচাতে থাকল। অনেকক্ষণের চেষ্টায় প্রথমে ডান পা, পরে বাঁ পা বরফের কামড় থেকে বেরিয়ে এল। উদ্বেগ আর ক্লান্তিতে ইন্দ্র হাঁপাচ্ছিল। দু'পায়ের ওপর দাঁড়াতে গিয়ে বুঝতে পারল পিঠের শিরদাঁড়ায় দারুণ ব্যথা। কুঁজো পিঠ সোজা হচ্ছে না। দুটো পা লোহার মুগুরের মতো ভারী। ডান হাত ফুলেছে, বেজায় ব্যথা, হয়তো ভেঙে গেছে। তুষারক্ষতও হতে পারে।

সূর্য উঠেছে। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। ঝকঝকে, ঘন রোদ এসে পড়েছে তার শরীরের ওপর। রোদ তো নয়, যেন উষ্ণ জীবন! কী আরাম! কঠিন বরফে রোদ প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে তার দু'চোখে লাগছে। তাকানো যাচ্ছে না। সূর্যালোকিত বরফের দিকে পনেরো মিনিট খালি চোখে তাকিয়ে থাকলে একজন মানুষের অন্ধ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। গলায় ঝোলানো স্নো-গ্লাসটা খুলে বরফ মুছে পরিষ্কার করার সময় সেটা ইন্দ্রনাথের হাত থেকে পড়ে গেল। চোখের পলকে ত্রিশ ফুট নীচে গড়িয়ে চলে গেল সেটা। ত্রিশ ফুট নেমে স্নো-গ্লাস তুলে আনার শক্তি আর ইন্দ্রের শরীরে নেই। ইন্দ্রের মনে পড়ল, চশমার রঙিন অ্যাটাচিটা জ্যাকেটের বুকপকেটে আছে। পকেট থেকে অ্যাটাচি বার করে চোখের সামনে ধরে এক পা এগোতেই ইন্দ্রনাথের শরীর দুলে উঠল। টলমল করতে থাকল বরফের পৃথিবী। ইন্দ্রনাথ বুঝল, তার হাঁটার শক্তি নেই। বরফে কোমর ঘসে কিছুটা গিয়ে একটা ঢলের ওপর ওর শরীরটা স্থির হয়ে গেল। ঢলের ঠিক নীচেই একটা ছোট উপত্যকা, নরম তুষারে ঢাকা। উপত্যকাটা ইন্দ্রর খুব চেনা লাগল। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের ষাট-সত্তর ফুট ওপরে এই উপত্যকাটা, ক্যাম্প থেকেই ও দেখেছিল। হামাগুড়ি দিয়ে ঢলের কিনারায় এসে শরীরটা ছেড়ে দিতেই ত্রিশ ফুট নীচে সেই বরফের উপত্যকার ওপর ইন্দ্রনাথ আছড়ে পড়ল। খুব একটা ব্যথা লাগল না। হয়তো ব্যথা পাওয়ার অনুভূতিটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। পিছলে পড়ার সময় শক্ত মুঠিতে অ্যাটাচিটা ধরে থাকলেও পড়ার পর ইন্দ্রনাথ দেখল, সেটা হাতে নেই। কটকটে, চোখধাঁধানো রোদ। ইন্দ্রনাথ বরফের দিকে তাকাতে পারছে না। কোনওমতে উপত্যকার নরম বরফের ওপর উঠে দাঁড়াতেই ইন্দ্রনাথ দেখল, অমূল্যকে নিয়ে চার নম্বর ক্যাম্পের পথে মুনমুন নেমে যাচ্ছে। হাত নেড়ে তাদের দুজনকে বিদায় জানাচ্ছে বাবুলাল।

ইন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখতে পেল মুনমুন। চেঁচিয়ে উঠল, "ইন্দ্রদা···।" এবার বাবুলাল দেখল ইন্দ্রকে।

বাবুলাল প্রশ্ন করল, "কেমন আছিস ইন্দ্র?"

"আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। একটা স্নো-গ্লাস দে।"

"আমার কাছে এই একটাই, আর নেই।" বাবুলাল জানাল।

প্রায় চোখ বুজে ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে ছিল। বাবুলালের কথায় চোখ খুলল। একটু এগোলেই সামনে একটা ফাটল। খুব চওড়া নয়, লাফিয়ে পেরোনো যায়। কিন্তু সে কি লাফাতে পারবে? লাফাতে না পারলে ফাটলটা কাটিয়ে ঘুরপথে যেতে হবে। সে অনেক শক্তি আর সময়ের ব্যাপার। একলাফে এই ফাটলটা পেরিয়ে যেতে পারলে হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে। শরীরের সব শক্তি, সাহস এবং বাঁচার আকুলতা একটা লম্বা নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে, আহত ক্ষতবিক্ষত শরীরে সেই ফাটলের ওপর দিয়ে ইন্দ্রনাথ একটা লাফ মারল। পেরেছে। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের একটু আগেই বাবুলাল বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ইন্দ্রনাথকে। তারপর প্রশ্ন করল, "প্রদীপ কোথায়?"

কী একটা বলতে গিয়ে বাবুলালের বুকের ওপরে ইন্দ্রনাথ বেহুঁশ হয়ে গেল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগের একটা দৃশ্য হঠাৎ বাবুলালের মনে পড়ল। তার নাইলনের দস্তানাটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে প্রবল বাতাসে টুপটুপ করে পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে।

সত্যঘটনা অবলম্বনে

ছবি : অনুপ রায়

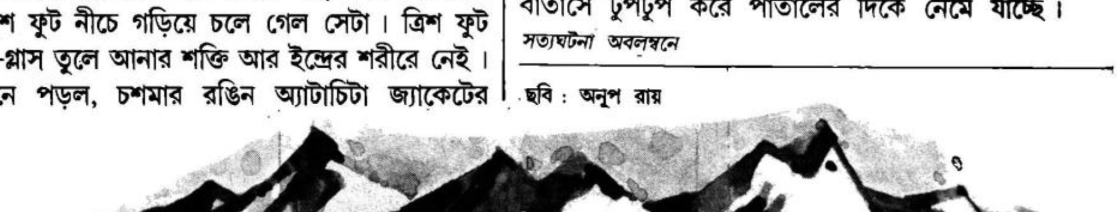

জলে আমার ছায়া দেখে চমকে গেলাম !

ওড়িয়া গল্প

কুমিরের বউ

মনোজ দাস

পাশ্চাত্য দেশের সমাজবিজ্ঞানী ডঃ ব্যাটস্টোন জলাভূমি আর বালির রাস্তা দিয়ে মাইল পঞ্চাশেক জিপ গাড়িতে এসে তারপর বাকি পথ গোরুর গাড়িতেই আসছিলেন। কিন্তু গোরুর গাড়ির চাকা গেল কাদায় আটকে, তাই তাঁকে হেঁটে আমাদের গ্রামে আসতে হল।

ডাক্তার ব্যাটস্টোন হচ্ছেন আকাশছোঁয়া বাড়ির দেশের মানুষ। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের সত্যিকার গ্রামের সম্বন্ধে জানতেই তাঁর আসা। এখন গ্রামের চেহারা বদলে গেছে, গ্রাম বলতে বাজার আর নানান বিজ্ঞাপন। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে তো আর এমন ছিল না।

ডাক্তার ব্যাটস্টোন এসে আমাদের খোলামেলা বারান্দায় বসলেন একটি চেয়ারে, আর প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তরই বলতে লাগলেন, "কী সুন্দর, কী চমৎকার!"

গ্রামের মানুষ কখনও কল্পনাও করেনি যে, সাদা চামড়ার একজন মানুষ তাদের গাঁয়ে এসে বসবে। তারা খুশি হয়েছিল। ডাক্তার ব্যাটস্টোনকে ঘিরে সরল মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে গ্রামের জ্ঞানীগুণী মানুষও কিছু ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছাকাছি বসে ছিলেন। এই সব সরল মানুষকে দেখে তাঁর এতই ভাল লেগেছিল যে, বললেন, "আমি এমনই মুগ্ধ হয়েছি এখানে এসে যে, দুঃখ হচ্ছে কেন নাচতে জানি না, তা হলে এদের আনন্দ দিতে পারতাম।"

সাহেব প্রশ্ন করেন, আমি অনুবাদ করে দিই। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা ভূতে বিশ্বাস করো?"

সকলে একসঙ্গে মাথা হেলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

ডাক্তার ব্যাটস্টোন বললেন, "দ্যাখো, এরা কত সরল। যা বিশ্বাস করে, তা স্বীকার করে। আমার দেশের শতকরা অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ ভূতে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার করে না।"

এরপর অনেকে অনেক দুষ্টু ভূত আর ভাল ভূতের গল্প করতে লাগল। গল্পের মধ্যেই ডাক্তার ব্যাটস্টোন বললেন, "কাল কিন্তু আমি তোমাদের নদীতে স্নান করব।"

আমি বললাম, "নদীতে কুমির আছে, তাই ভয় হয়।"

আমার কথা শুনে গ্রামের একজন বললেন, "যতক্ষণ কুমিরের বউ রয়েছে, ততক্ষণ আর আমাদের ভয় কোথায়?"

"কুমিরের বউ? সেটা কী?" জানতে চান ডাক্তার ব্যাটস্টোন।

আমি বললাম, "সে এক কাহিনী।"

তিনি গল্প শোনার জন্যে ব্যস্ত হলেন। আমি তখন শুরু করলাম। "অনেক দিন আগে নদীর ধরে দুই বুড়োবুড়ি বাস করত। তাদের একটি মেয়ে ছিল। তার তিন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু অল্প দিন পরেই তার স্বামী মারা যায়। সাড়ে চার বছর বয়সে সে বাবা আর মার কাছে ফিরে আসে।

"তাকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ক্রমশ সে বড় হয়ে উঠল। একদিন সকলের সঙ্গে সে নদীতে স্নান করছে, এমন সময় এক কুমির তাকে টেনে নিয়ে গেল। সবাই ভাবল, সে মারা গেছে। কিন্তু এক যুগ পরে সে হঠাৎ ফিরে এল। তখন তার বাবা মারা গেছে, মাও মৃত্যুশয্যায়, আর কুঁড়েঘরখানি ভেঙে পড়েছে।

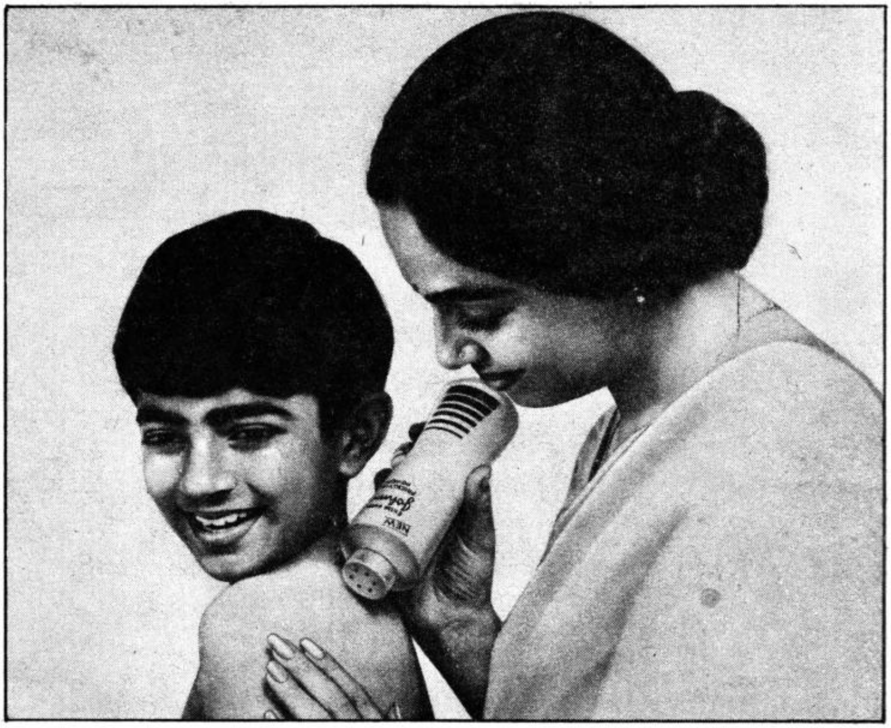

এখন পাবেন!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার

এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে।

ঘামাচিতে আক্রান্ত হবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে সক্ষম?
এখন আরো কার্য্যকরীভাবে আপনি আপনার ঘামাচি সংক্রান্ত সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার। এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আরো বেশি কার্য্যকরী কেন?
আপনি যখন ঘেমে একেবারে নেয়ে ওঠেন, এবং যখন এই ঘাম আপনার ত্বকে বেশিক্ষণ ধরে থেকে যায়, তখনই আপনি ঘামাচির সম্ভাব্য শিকার হ'তে পারেন। ঠিক এই কারণেই নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এত কার্য্যকরী।

ঘাম ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেবার উপযুক্ত করে বিশেষ ফরমূলাতে তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া এটি ত্বকের ওপর ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ রোধ করে। তাই আর লালচে র‍্যাশ নয়, নয় কোনো জ্বলুনি বা চুলকানি। সত্যি কী দারুণ আরাম! অধিকন্তু, নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এখন একটি মনমাতানো নতুন সুগন্ধে সমৃদ্ধ।

আগামী গ্রীষ্মে ঘামাচিতে আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন না, তাড়াতাড়ি নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের একটি প্যাক নিন। শুধু শুধু ঘামাচিতে কষ্ট পাবেন কেন. আপনি যখন তা রোধ করতে পারেন?

৩ ভাবে কাজ করার জন্য বিশেষ ফরমূলাতে তৈরী:

ঘাম আরো ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেয়।

ত্বকে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ রোধ করার জন্য এতে আছে বিশেষ ঔষধি।

আরামপ্রদ ভাবে কার্য্যকরী বলে ত্বককে ঠাণ্ডা ও তরতাজা রাখে।

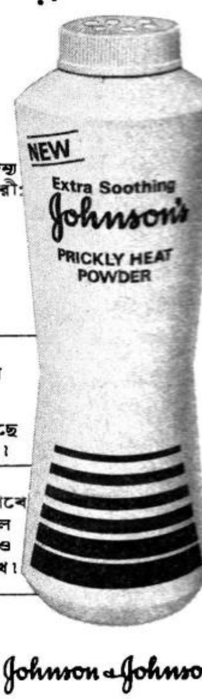

Johnson & Johnson

OBM/4181 BEN

"এর দুদিন পরে দেখা গেল, একটা কুমির নদীর বাঁধের উপর দিয়ে ওই কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাঁধে মাটি আলগা ছিল, কুমিরের ভার রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামের লোকেরা তাকে মেরে ফেলে। ক'দিন পরেই মেয়েটির মা মারা যায়। দুঃখে-শোকে মেয়েটি দিনরাত কান্নাকাটি করত, আর কুঁড়েতেই থাকত। গ্রামের লোকে বলে, কুমির মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি তার বাবা আর মাকে দেখতে এসেছিল। কুমির আসছিল মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তখনই গ্রামের লোক তাকে মেরে ফেলেছে।"

গল্প শুনে ডাক্তার ব্যাটস্টোন হেসে বললেন, "অবিশ্বাস্য !"

গ্রামের লোক বলল, "এটা সত্যি, কারণ সেই জন্যেই কোনও কুমির আমাদের গ্রামের লোককে কিছু বলে না। তাই ওই মহিলাকে সকলে কুমিরের বউ বলে। সে এখনও বেঁচে আছে। তার বয়স নব্বই বছর হবে। গ্রামের লোকেরা পালা করে তাকে খাওয়ায়, তার কুঁড়ে সারিয়ে দেয়।"

"কুমির নিয়ে যাবার পর দশ বছর মেয়েটি কী করছিল ?"

"তা তো আমরা জানি না। যদি জানতে চান, তবে আজ আমরা কুমিরের বউয়ের কাছে নিয়ে যাব।"

"খুব চমৎকার হবে !"

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের পথ দিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে ব্যাটস্টোনকে নিয়ে গেলাম কুমিরের বউয়ের বাড়ি। বৃদ্ধা তখন নিজের মনে গান করছিলেন, হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে। পাশে কেরোসিনের আলো জ্বলছিল।

আমরা তাঁর পাশে বসে পড়ে তাঁর পাথরের বাসনে দুধ আর ভাত মেখে ঢেলে দিলাম, যাতে তাঁর খেতে অসুবিধা না হয়। কারণ তাঁর তো দাঁত নেই। আমাদের দেখে তিনি হাসলেন।

"ঠাকুমা দ্যাখো, সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এক সাহেব এসেছে তোমার কাছে গল্প শোনার জন্যে।"

"বেশ তো, আমি উড়ে বেড়ানো রাজপুত্তুর আর রাজকন্যার গল্প বলব।"

"না ঠাকুমা, ওই গল্প শুনতে চাই না। আমরা তোমার গল্প শুনতে চাই। জানো তো, তোমাকে সকলে বলে কুমিরের বউ। কুমির নিয়ে যাবার পর দশ বছর তুমি কী করলে ?"

"কুমির আমাকে নিয়ে সাত-তালগাছ গভীর জলে ডুব দিল, আমি ভেবে পেলাম না কী করব..."

কথার মধ্যেই বাধা দিলাম। "গল্প নয় ঠাকুমা, যা ঘটেছিল তা-ই বলো।"

"বলছি শোনো, গভীর জলের তলায় গিয়ে আমার জ্ঞান ফিরে এল। তাকিয়ে দেখলাম কুমির আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমি কিছুতেই আমার দৃষ্টি সরাতে পারলাম না। আমিও তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।"

আমরা আবার বাধা দিলাম, "তুমি পালিয়ে এলে কী করে ?"

"পালাব কী করে ? দৃষ্টিই তো সরাতে পারছি না। পরে পালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। আমরা থাকতাম এই গ্রাম থেকে কয়েক মাইল উত্তরে, দুটি নদীর মোহনায়। একদিন সুযোগ এসে গেল, আমি জলের ওপর ভেসে উঠলাম। হঠাৎ জলে আমার ছায়া দেখে চমকে গেলাম আমি। এ যে কুমিরের চেহারা ! কখন এমন হল ? যখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, তখন ? না যখন কুমির একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, তখন ?"

কুমিরের বউ গল্প বলে চলেন। নিজের চেহারা কুমিরের মতো হয়ে যাওয়ায় তিনি ভীষণ দুঃখ পান আর কাঁদতে থাকেন। কুমির তখন তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু বউয়ের কান্না আর থামে না। শেষে কুমির বলল, "তুমি কান্না থামাও, আমি তোমাকে মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করলেই তুমি মানুষ হয়ে যাবে। তবে আমি কাছে থাকলে তা হবে না, কারণ আমি উল্টো মন্ত্র পড়ব, তাতে তুমি আবার কুমির হয়ে যাবে।"

মন্ত্র পেয়ে খুব খুশি। কুমির বলল, "আমি যখন দূরে যাব, তখন মন্ত্র পোড়ো।"

পরের দিন কুমির বাইরে যাবার সময় বলল, "আমি যাচ্ছি, তুমি এবার মন্ত্র পড়তে পারবে। তবে সাবধান, গভীর জলে মন্ত্র পোড়ো না, কারণ তখন তুমি মানুষ হয়ে যাবে, আর ডুবে যাবে।" কথা বলতে বলতে কুমিরের চোখে জল এসে গেল। বলল, "জানি, আমি ফিরে এসে আর তোমাকে দেখতে পাব না।"

কুমিরের চোখে জল দেখে মেয়েটির বড় কষ্ট হল। সে মন্ত্র পড়ল না। কুমির ফিরে এসে তাকে দেখে ভীষণ খুশি। এরপর তারা দুজনে অনেক ঘুরেছে। একবার ঘুরতে-ঘুরতে নদীর ধারের এক তীর্থের কাছে এল। সে তখন কুমিরকে জিজ্ঞেস করল, "আমি কিছুক্ষণের জন্য মানুষের রূপ ধরে ঠাকুর দর্শন করে আসব ?"

কুমির খুব খুশি হয়ে মত দিল। তখন মেয়েটি ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে মন্ত্র পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে গেল। ঠাকুর দর্শন করে সন্ধ্যায় যেই সে জলে ঝাঁপ দিল, সঙ্গে-সঙ্গে কুমির তাকে মন্ত্র পড়ে আবার কুমির করে নিল। এই রকম করে সে অনেক তীর্থ দর্শন করল। মনে খুব ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও সে বাড়ি যায়নি, কারণ তার ধারণা ছিল, বাড়িতে মা-বাবাকে দেখলে সে হয়তো আর জলে ফিরে আসতে পারবে না।

শেষে একদিন বাবা আর মা'র জন্যে তার বড়ই মন কেমন করল। তখন সে কুমিরের অনুমতি চাইল। কুমির অবশ্য অনুমতি দিয়েছিল, তবে একটি শর্তে, একদিনের বেশি থাকতে পারবে না।

মেয়েটি তাদের কুঁড়েঘরে ফিরে এসে দেখে, তার বাবা নেই। মা মৃত্যুশয্যায়। কাছাকাছি কেউ নেই যে, তার মায়ের মুখে জল দেয়। তাই সে ঠিক করল, মা'র মৃত্যুর পর জলে ফিরে যাবে।

এদিকে দুদিন কেটে গেছে দেখে কুমির ব্যস্ত হয়ে ওদের বাড়ির দিকে আসছিল। তখনই গ্রামের মানুষ তাকে মেরে ফেলে। এই ঘটনার পর ষাট বছর কুমিরের বউ বেঁচে ছিল।

কুমিরের বউয়ের গল্প শুনে, আমরা ফিরে এলাম। পথে চাঁদের আলো। সবাই চুপচাপ হাঁটছিলাম আমরা। ডাক্তার ব্যাটস্টোনের এত ভাল লেগেছিল যে, বহুদিন পরেও যখন আমাকে চিঠি দিয়েছেন, তখনও লিখেছেন এই কথা।

অনুবাদ : মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি : প্রবীর সেন

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো
তোমার খেলাঘর!"

— ফেভি ফেয়ারী

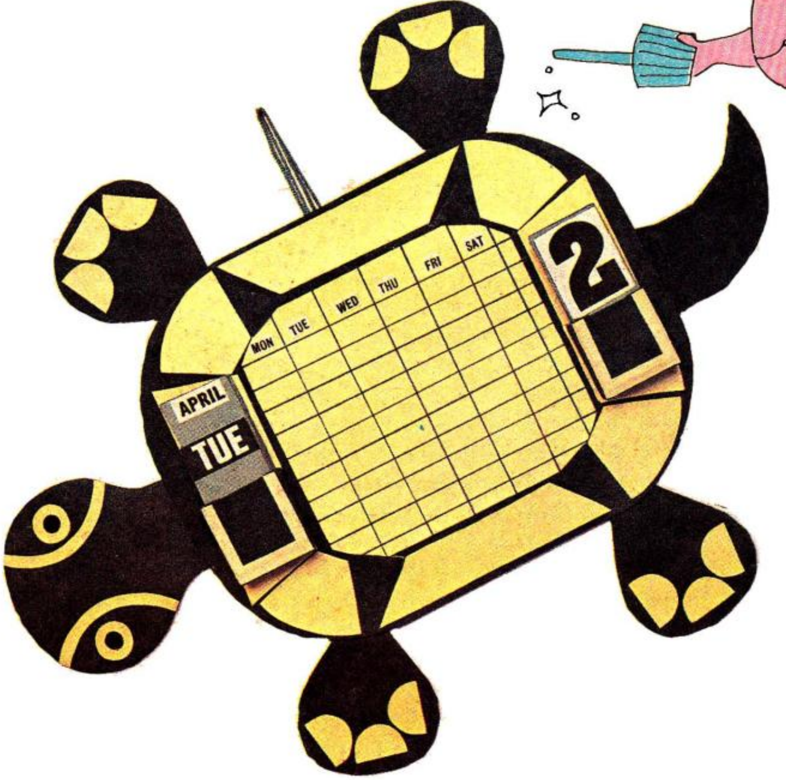

চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি—বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

'টাফি দি টর্টয়েজ' কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে,
সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি
পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী",
পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

'টাফি দি টর্টয়েজ' কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে
বিনামূল্যে তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান:
"ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম : ______________________

বয়স : ______________________

ঠিকানা : ______________________

____

সহর : ______________________

রাজ্য : ____________ পিনকোড : ____________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফট্‌ পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ/না

(AM)

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

Ⓡ এইটি আর ফেভিকল ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ,
বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-4864 BN

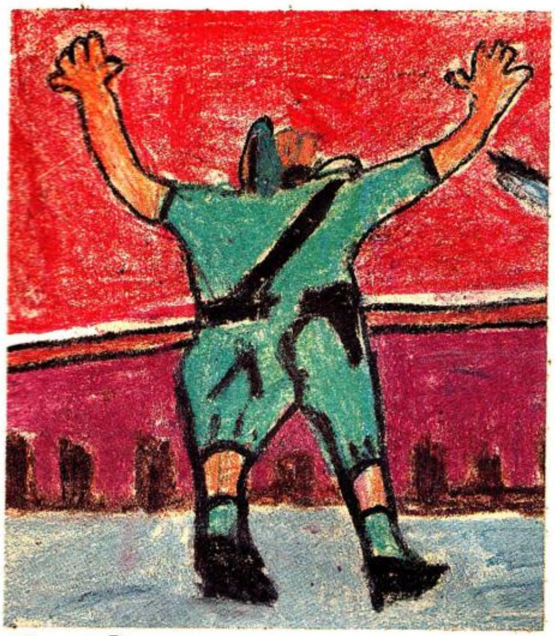

ছবি : **মানসী দে** (বয়স ৯)

ছবি : **মৌসুমী দত্ত** (বয়স ৪)

ছবি : **দেবশ্রী দত্তরায়** (বয়স ৫)

ছবি : **সুলগ্ন বিশ্বাস** (বয়স ১২)

ছবি : **সোমা গঙ্গোপাধ্যায়** (বয়স ৬)

ছবি : **অর্ক পাল** (বয়স ৭)

স্নেহ

নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড্ মিল্ক পাউডার

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন—চা বা কফি, দই বা মিষ্ঠান্ন বানানোর জন্যে।

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।

স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!

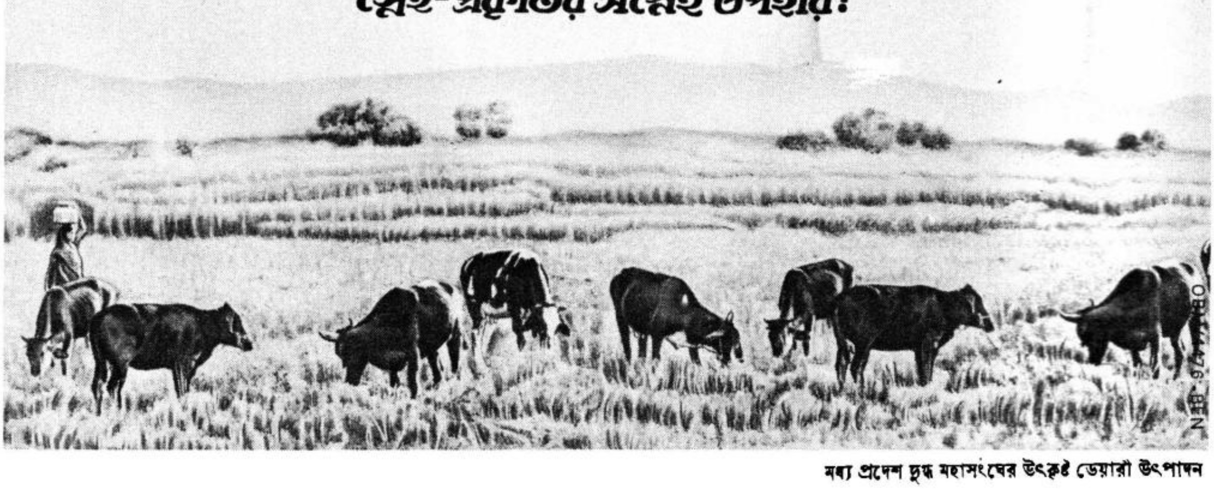

মধ্য প্রদেশ দুগ্ধ মহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন

ভবঘুরের রোজনামচা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

চার্লস ডারউইন আর আব্রাহাম লিঙ্কন একই দিনে জন্মেছিলেন। ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি চার্লস-এর জন্ম ইংল্যাণ্ডের শ্রুসবেরিতে। তাঁর বাবা রবার্ট। মা জোসিয়া। ঠাকুর্দা আর বাবা দুজনেই ছিলেন ডাক্তার। চার্লসও ডাক্তার হবে, এটা ছিল তার বাবার বাসনা। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই চার্লস-এর মন চলে গিয়েছিল অন্য দিকে।

সেকালে ইস্কুলে বিজ্ঞান পড়ানোর রেওয়াজ ছিল না। ঘরে বসে কবিতার কচকচি আর পুঁথিপড়া বিদ্যেয় চার্লস-এর একেবারেই মন উঠত না। ঘরের বাইরে ঘুরে ঘুরে উদ্ভিদ সংগ্রহ আর পশুপাখি খুঁটিয়ে দেখা ছিল তার বাতিক। ছেলের ওপর চটে গিয়ে রবার্ট একবার লিখেছিলেন, "শিকার করা, কুকুর পোষা, ইঁদুর ধরা— এ ছাড়া আর কিছুতেই তোমার মন নেই। এই করে নিজে তো বদনাম কিনবেই, সেই সঙ্গে বংশেরও নাম ডোবাবে।"

ডাক্তারি পড়ায় একেবারেই মন বসছে না দেখে চার্লসকে ধর্মশাস্ত্র পড়তে কেমব্রিজে পাঠানো হল। সেখানেও একটু ফাঁক পেলেই বন্দুক ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া, তাস খেলা, দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড় করা আর যত রাজ্যের কাঁচাপোকা-গুবরেপোকা যোগাড় করা।

কেমব্রিজে পড়ার সময় চার্লস হয়েছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হেনস্লো-র খুব ন্যাওটা। চার্লস-এর বাবার চেয়েও চার্লসকে তিনি ঢের ভাল বুঝতেন। স্নাতক হয়ে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে হেনস্লো 'বিগল' জাহাজে প্রাণীবিদ হিসেবে একটা কাজ নেবার কথা বললেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন এমন একজন ছোকরাকে খুঁজছিলেন যে তাঁর সঙ্গে কেবিনের একপাশে থেকে জলপথে ঘুরে ঘুরে বিনা মাইনেতে এ-কাজ করবে। ভূপর্যটক এই জাহাজটা ছিল ইংরেজ বেনেদের। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, ব্যবসা বাড়ানোর উপায় আর সেই সঙ্গে বাণিজ্যপথ খুঁজে বার করা।

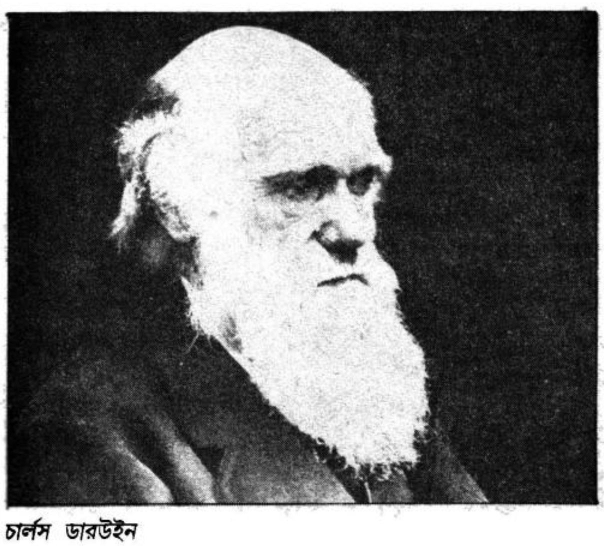

চার্লস ডারউইন

বাবা গোড়ায় ছেলেকে যেতে দিতে চাননি। চার্লস-এর মামা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষে তাঁকে রাজি করান।

এদিকে আবার আরেক মুশকিল। চার্লস-এর নাক দেখে ক্যাপ্টেন বেঁকে বসলেন। বললেন, যাদের ওরকম নাক, তাদের জাহাজে ঘোরার উৎসাহ বা ইচ্ছাশক্তি, কোনওটাই থাকে না। যাই হোক, বলেক'য়ে তাঁকেও রাজি করানো গেল। পরে অবশ্য ক্যাপ্টেন কবুল করেছিলেন, নাক দেখে সব সময় মানুষের চরিত্র বোঝা যায় না।

১৮৩১-এর ২৭ ডিসেম্বর প্লিমাথ বন্দর থেকে 'বিগল' তার যাত্রা শুরু করে।

ডারউইন যেখানেই যান, যা-ই দেখেন— উদ্ভিদ, প্রাণী আর প্রস্তরস্তূপ— সেসব তথ্যে তথ্যে ভরে তোলেন তাঁর রোজনামচা। তাঁর মনে হয়, প্রকৃতির যা-কিছু বৈচিত্র্য তাঁর চোখে পড়েছে, তার ব্যাখ্যা পুরনো মতে হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটা জাতের গাছপালা জীবজানোয়ার আলাদা আলাদাভাবে জন্মেছে, এই প্রচলিত ধারণাটা তাঁর কাছে একেবারে ভুল বলে মনে হল। (ক্রমশ)

জেনে নাও

বেড়ালের চোখ জ্বলে কেন

আমরা দেখেছি রাতের অন্ধকারে বেড়ালের চোখ জ্বলে। কিন্তু কেন?

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীরই চোখ তিনটি স্তর দিয়ে গঠিত। বাইরের স্তরটা অস্বচ্ছ আর সাদা রঙের। একে বলে '**স্ক্লেরা**'। এই স্তরের ঠিক নীচেই রয়েছে রঞ্জক মাখানো জালিকা দেওয়া 'কোরয়েড' স্তর। আর একেবারে ভেতরের দিকে আছে সংবেদনশীল স্নায়ু-স্তর। এটাই রেটিনা। কোরয়েড স্তরে বেড়াল বা শেয়াল, বাঘ, সিংহ, হায়েনার বেলায় আলো প্রতিফলন করার মতো এক ধরনের রঞ্জক থাকে। একে বলে 'ট্যাপেটাম লুসিডাম'।

এখন বাইরের আলো মণির ভেতর দিয়ে গিয়ে রেটিনাতে পড়ে। মনে হতে পারে, সূচীভেদ্য অন্ধকার হলে আলো আসবে কোথা থেকে? কিন্তু বিজ্ঞানে সূচীভেদ্য অন্ধকার বলে কিছু নেই। একটু আলো থাকেই। সেই আলো, রেটিনা ঈষৎ স্বচ্ছ বলে রেটিনা থেকে কোরয়েডে গিয়ে পড়ে। শেষে প্রতিফলিত হয়ে সবটাই ফিরে আসে। তাই আমরা বেড়ালের চোখ জ্বলতে দেখি। আসলে চোখ জ্বলে না।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সোমার টিফিন

সাধনা মুখোপাধ্যায়

সোমার মুখেতে আর
রোচে নাকো কেক,
টিফিনে দিলেই বলে
খেয়েছি অনেক।
মা তবুও দেন রোজ
যত্নে গুছিয়ে
কেক ডিম সন্দেশ
শশাটা কুচিয়ে।
টিফিন হলেই আসে
চোখ ফেটে জল,
হেনাকে সে ডেকে বলে
খাওয়া যায় বল ?

হেনা আনে ছোট তার
কৌটোতে ভরি
দুটি রুটি আর কিছু
বাটিচচ্চড়ি।
সোমা তাকে ডেকে বলে
খাবি নাকি কেক,
মা আমার নিজ হাতে
করেছেন বেক্।
হেনাও সোমাকে বলে
খা না চচ্চড়ি,
মা আমার নিজ হাতে
দিয়েছেন বড়ি।

এ-ওর টিফিন খায়
সেই থেকে রোজ,
এ শশায় ও মরিচে
করে সুখে ভোজ।
পিঁপড়েরা বৃথা করে
খাবারের খোঁজ।

জ্যোতিষী মতি শী

শ্যামলকান্তি দাশ

আপনি লোকটি সুবিধের নন
খাঁদু ঘোষালের মতনই বিচ্ছু,
লম্বা লম্বা কথা বলছেন ?
এ-জীবনে আর হবে না কিচ্ছু।

ফলিতজ্যোতিষ কাকে বলে, আগে
জেনে নিন, পরে মারবেন গুল,
রামনবমীতে মাজায় বাঁধুন
শ্বেত বেড়েলা ও অনন্তমূল।

আমার বিধান ভুল হলে আমি
সংসারে এক নিকৃষ্ট গোরু,
সব ছেড়েছুড়ে দুঃখিত মনে
নিকুঞ্জে বসে বাজাব ডমরু।

আপনি হোন্ না রুই-কালবোস,
রেসুড়ে, ফাঁসুড়ে, গেরোবাজ, খুনি,
ধারণ করতে হবে অবশ্য
উজ্জয়িনীর নীলা এক্ষুনি।

দেখবেন তেড়ে উঠবে ললাট
কেতু ধূমকেতু চমকাবে হাতে,
ভাগ্য-কুমড়ো গড়াগড়ি দেবে
বোঁদে-মিহিদানামাখা দুধভাতে।

উজ্জয়িনী তো ধারেকাছে নয়,
সে তো ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর—
পুষ্পকরথে পৌঁছুতে লাগে
ঠিক তেরো দিন, আজ্ঞে হুজুর।

আজ সায়াহ্নে মাহেন্দ্রযোগ
কল্য প্রভাতে যাত্রা নাস্তি,
পরের জন্যে জ্যোতিষী মতি শী
মাথা পেতে নেয় চরম শাস্তি।

'শ্রীহরি, শ্রীহরি' বলে বেরোলাম
দিন কিছু-কম দশশত টাকা,
উজ্জয়িনীর নীলার লীলায়
ঘুরে যাবে ঠিকই ভাগ্যের চাকা !

ছবি : দেবাশিস দেব

নীলকান্তমণি-রহস্য

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : কাঁধে মরা হাঁস ঝুলিয়ে যে-লোকটা হাঁটছিল, গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করতে সে লাঠি ঘোরাতে থাকে। ফলে একটা দোকানের কাচ ভেঙে যায়। পুলিশ কমিশনার তাকে সাহায্য করতে গেলে সে টুপি ও হাঁস ফেলে চম্পট দেয়। পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে হাঁসটা কাটতে তার ছোট পেট থেকে যা বেরোয়, সেই বস্তুটি দেখে শার্লক হোম্‌স বলেন, "এ হল দারুণ দামি ব্লু-কারবাঙ্কল হিরা। কসমোপলিটান হোটেল থেকে চুরি গিয়েছে।" চুরির দায়ে ধরা হয়েছিল এক মিস্ত্রিকে। তার নাম জন হর্নার। যাই হোক, হাঁস পাওয়া গেছে বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যে-লোকটি এসে হোমসের সঙ্গে দেখা করে, তার নাম হেনরি বেকার। তার হাঁসটা খেয়ে ফেলা হয়েছে শুনে সে দুঃখিত নয়, তার বদলে আর-একটা হাঁস পেয়েই সে খুশি। লোকটি জানায়, সে যে-ক্লাবের সদস্য, সপ্তাহে-সপ্তাহে কয়েক পেনি জমা রাখলেই বড়দিনের সময় সেখান থেকে একটা হাঁস উপহার পাওয়া যায়। সেই হাঁস নিয়েই সে বাড়ি ফিরছিল। বোঝা যায়, লোকটি মিথ্যে কথা বলছে না। তারপর ...

হোম্‌সকে অনেকবার ধন্যবাদ দিয়ে বেশ ঘটা করে অভিবাদন জানিয়ে হেনরি বেকার চলে গেল। লোকটির রকম-সকম দেখে আমার বেজায় হাসি পাচ্ছিল। লোকটি চলে গেলে হোম্‌স বললে, "তাহলে হেনরি বেকারের পালা সাঙ্গ হল। বোঝাই গেল, আসল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কিছুই উনি জানেন না। ওয়াটসন, তোমার কি খিদে পেয়েছে?"

বললুম, "না, কিন্তু কেন বলো তো?"

"তবে চলো একটু ঘুরে আসা যাক। আমাদের হাতে যে সূত্র হঠাৎই এসে পড়েছে, তা একবার যাচাই করে দেখে আসি।"

"উত্তম প্রস্তাব!"

বাইরে বেরিয়ে দেখি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মাফলারে গলা বেশ ভাল করে ঢেকে আমরা ওভারকোটের সব বোতাম আটকে নিলুম। আকাশে তারাগুলো সব চকচক করছে। আকাশে কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। রাস্তায় যেসব লোকজন হাঁটছে তাদের নিশ্বাসের শব্দ ঠিক পিস্তলের গুলি ছোঁড়ার ফট ফট শব্দের মতো শোনাচ্ছিল। ফুটপাথে জুতোর খট খট আওয়াজ তুলতে তুলতে আমরা উইমপোল স্ট্রিট ধরে হারলি স্ট্রিট হয়ে উইগমোর স্ট্রিট পেরিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে এসে পড়লুম। মিনিট-পনেরোর মধ্যে আমরা ব্লুসবেরি অঞ্চলের আলফাইনের কাছে এসে পড়লুম। যে রাস্তাটা হবোর্নের দিকে গেছে তারই কোণে এটা একটা ছোট রেস্টুর‍্যান্ট। হোম্‌স দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দু'কাপ গরম কফির অর্ডার দিলে। হোটেলের মালিকটি যাকে বলে লালমুখো।

"তোমার হাঁসের মাংস যেরকম ভাল খেতে, তোমার কফিও যদি সেরকম হয় তাহলে তো দারুণ ব্যাপার হবে," হোম্‌স বললে।

আলফা ইনের মালিক রীতিমত আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার হাঁস? মানে—"

"হ্যাঁ। এই তো আধ ঘণ্টা আগেই আমি মিঃ হেনরি বেকারকে বলছিলুম। বেকার তো তোমার গুজ ক্লাবের একজন সভ্য।"

"ও, তাই বলুন। এখন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সে তো আমার হাঁস নয়।"

"তাই নাকি? তবে ওগুলো কার হাঁস।"

"কভেণ্ট গার্ডেনের এক দোকানদারের কাছ থেকে আমি দু-ডজন কিনে এনেছিলুম।"

"আচ্ছা। ওখানকার কয়েকজন মাংসওলার সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। তা এগুলো কার দোকানের?"

"এগুলো ব্রেকেনরিজের দোকান থেকে নিয়েছিলুম।"

"না, ওকে আমি চিনি না। আচ্ছা আজ উঠি। তোমার ব্যবসা দিনে দিনে জমে উঠুক এই কামনা করি।"

রেস্টুর‍্যান্ট থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে জোর বাতাস দিচ্ছে। এই বাতাসের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে হোম্‌স বললে, "চলো এবার তবে ব্রেকেনরিজের সন্ধান করা যাক। ... বুঝলে ওয়াটসন, যদিও আমরা একটা হাঁসের পেছনে ধাওয়া করেছি এ কিন্তু নিছক বুনো হাঁস তাড়া করা নয়। মনে রেখো এর সঙ্গে একজন লোকের ভাগ্য, তার ভাল-মন্দ জড়িয়ে রয়েছে। আমরা যদি এ-কথা প্রমাণ করতে না পারি যে, সে কোনও দোষ করেনি তাহলে খুব কম হলেও তার অন্তত সাত বছর জেল হবে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, আমাদের অনুসন্ধানের ফলেই তার দোষ প্রমাণ হবে আর তার সাজা হবে। কিন্তু সে যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে যে, আমাদের হাতে এমন একটা সূত্র, বলতে পারো প্রায় বরাত জোরেই এসে গেছে, যার খবর পুলিশ পায়নি। তাই এ-ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত আমাদের দেখতেই হবে। সুতরাং, চলো বন্ধু, এখন দক্ষিণ দিকে হাঁটা দিই।"

আমরা হবোর্ন ছাড়িয়ে এণ্ডেল স্ট্রিট ধরে চললুম। তারপর বিভিন্ন রাস্তার গোলকধাঁধা পার হয়ে আমরা কভেণ্ট গার্ডেনের বাজারে এসে পৌঁছলুম। একটা বড় দোকানের সাইনবোর্ডে বেশ মোটা-মোটা হরফে ব্রেকেনরিজের নাম লেখা। ব্রেকেনরিজের মুখটা লম্বাটে, ঘোড়ার মতো। তবে নাক-চোখ বেশ ধারালো। আমরা যখন তার দোকানে গিয়ে হাজির হলুম তখন সে আর তার বাচ্চামতো এক সহকারী দোকান বন্ধ করার যোগাড় করছিল।

"গুড ইভনিং। আজ ঠাণ্ডাটা বেশ জব্বর পড়েছে," হোম্‌স বললে।

কোনও কথা না বলে অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে সে আমাদের

দিকে তাকিয়ে রইল। দোকানের মাল রাখবার সাদা মার্বেল পাথরের টেবিলটা দেখিয়ে হোম্‌স বললে, "সব হাঁসই বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি।"

"কাল সকালে যতগুলো চাই এমনকী পাঁচশোটা হলেও দিতে পারব।"

"তাতে আমার কাজ হবে না।"

"তাহলে ওই যে সামনের দোকানটায় আলো জ্বলছে, ওখানে গেলে পাওয়া যেতে পারে।"

"কিন্তু আমাকে যে বিশেষ করে এই দোকান থেকেই নিতে বলেছে।"

"কে বলেছে?"

"আলফা রেস্টুর‍্যান্টের মালিক।"

"বুঝেছি। তাকে আমি ডজন-দুই মাল দিয়েছিলুম বটে।"

"হাঁসগুলো দারুণ ছিল। ভাল কথা, ওগুলো কোথাকার হাঁস?"

হোম্‌সের এই কথায় দোকানদার যেরকম রেগে ঝাঁঝিয়ে উঠলে, তাতে তো আমি হতবাক।

ঘাড় বেঁকিয়ে হাতের আস্তিন গুটিয়ে দস্তুরমতো রুখে উঠে সে বললে, "আপনি ... আপনি কী বলতে চাইছেন শুনি? যা বলবার তা সোজাসুজি বলুন তো?"

"কোনও বাঁকা কথা তো বলিনি। বলছিলুম যে, আলফা রেস্টুর‍্যান্টের মালিককে যে হাঁসগুলো পাঠানো হয়েছিল সেগুলো কোথা থেকে যোগাড় করা হয়েছিল।"

"ও, তাই নাকি, এই কথা। যদি বলি বলব না—কী করবেন শুনি?"

"এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। না বলতে চাইলে বোলো না। তবে এই সাধারণ কথায় হঠাৎ এত রেগে যাবার মতো কী হল সেটা বুঝতে পারলুম না।"

"রেগে যাব না? যদি আপনাকেও কেউ এইরকমভাবে বিরক্ত করত তো আপনিও রেগে যেতেন। আরে বাবা ভাল জিনিস ভাল দামে কিনব, ভাল দামে বিক্রি করব। ব্যস্‌ ঝামেলা চুকে গেল। তা নয়, কোথাকার এক উটকো ফ্যাসাদ! সেই হাঁসগুলো কোথা গেল? কাকে বিক্রি করেছ? কত করে বিক্রি করেছ? যত সব আবোল-তাবোল প্রশ্ন। লোকগুলো এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, পৃথিবীতে ওই ক'টা ছাড়া আর যেন কোনও হাঁসই নেই।"

দোকানদারের কথায় কোনও আমল না দিয়ে হোম্‌স বললে, "যারা ওই হাঁসগুলো নিয়ে তোমাকে বিরক্ত করেছে তাদের আমি চিনি না। তবে তুমি যদি আমার কথার জবাব না দাও তো আমাদের বাজিটা আর হবে না। এই হাঁস-মুর্গির ব্যাপারে আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বাজি লড়তে রাজি। আমি একজনের সঙ্গে বাজি রেখেছি যে ওগুলো পাড়াগাঁয়ের হাঁস।"

"তাহলে আপনি বাজিতে হেরেছেন। ওগুলো শহর থেকে যোগাড় করা।"

"অসম্ভব। তা হতেই পারে না।"

"আমি বলছি এগুলো শহরের ফার্ম থেকে কেনা হাঁস।"

"তোমার কথা মানতে পারছি না।"

"আপনি কি মনে করেন হাঁস-মুর্গির ব্যাপারে আপনি আমার চাইতে বেশি বোঝেন? জানেন আমি ছোটবেলা থেকে এ কাজ করছি। আমি বলছি যে, যে হাঁস আলফার ম্যানেজারকে পাঠানো হয়েছিল তা পাড়াগাঁয়ের নয়, শহরের ফার্মে বড় করা।"

"বাজে কথা বোলো না।"

"বাজে কথা? বেশ আপনি আমার সঙ্গে বাজি লড়বেন?"

"সে তুমি বোঝো; তোমার পয়সা তুমি লোকসান করবে কি না। তবে আমি যে ঠিক বলছি সে ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, ধরো এক সভরেন বাজি। তাতে আর কিছু না হোক এই শিক্ষা পাবে যে, বাজে তক্ক করতে নেই।"

হোম্‌সের কথায় দোকানদার বেশ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। তারপর তার সহকারীকে বললে, "বিল, আমাদের খাতাটা নিয়ে এসো তো।"

বিল ছোকরা একটা ছোট নোটবই আর একটা বড় লেজার খাতা এনে টেবিলের ওপর আলোর সামনে রাখলে।

"এইবার সবজান্তা মশাই," হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে দোকানদার বললে, "এই ছোট খাতাটা দেখুন।"

"হ্যাঁ, তো কী হল?"

"আমি যাদের কাছ থেকে মাল কিনি তাদের নাম এই খাতাতে লেখা আছে। দেখতে পাচ্ছেন? এই পাতায় পাড়াগাঁর যে-সব লোকের কাছ থেকে মাল কিনি তাদের নাম লেখা আছে। আর নামের পাশে যে সংখ্যাটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে লেজার খাতার পাতার নম্বর। সেখানে কেনাবেচার সব হিসেব লেখা আছে। আর ওই পাতায় লালকালিতে লেখা নাম—সেগুলো আমার সব শহুরে পোলট্রি ফার্ম মালিকদের নামের তালিকা। এইবার এই তিন নম্বরের নামটা চেঁচিয়ে পড়ুন শুনি।"

"মিসেস ওকশট। ১১৭ ব্রিকস্টন রোড। ২৪৯," হোম্‌স চেঁচিয়ে পড়লে।

"ঠিক। এবার লেজার খাতার ২৪৯ পাতাটা খুলে দেখুন।"

হোম্‌স ২৪৯ পৃষ্ঠা খুললে।

"ওই তো লেখা রয়েছে—মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিকস্টন রোড, ডিম-হাঁস-মুর্গি যোগানদার।"

"বেশ। নীচে ওটা কী লেখা রয়েছে যেন?"

"২২ ডিসেম্বর। ২৪টা হাঁস প্রতিটা সাত শিলিং ছ পেন্স দরে।"

"ঠিক তো? তবে এবার কী হল? তলায় ওটা কী লেখা রয়েছে?"

"আলফার মালিক মিঃ উইণ্ডিগেটকে প্রতিটা বারো শিলিং দরে বিক্রি করা হল।"

"তাহলে সবজান্তামশাই, এবার কী বলছেন?"

দেখে মনে হল যে, হোম্‌স সত্যিই খুব দুঃখিত হয়েছে। তারপর অত্যন্ত বেজার মুখ করে একটা সভরেন পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তার হালচাল দেখে মনে হল সমস্ত ব্যাপারটায় সে এতই বিরক্ত হয়েছে যে, এ-বিষয়ে আর কোনও কথাই বলতে চায় না। দোকান থেকে বেরিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে গটগট করে খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াল। তারপর হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

"যখনই ওইরকম দাড়ি-গোঁফওলা লোকের পকেট থেকে লাল মলাটের বই উঁকি দিতে দেখবে তখনই তুমি নিশ্চিতভাবে জানবে যে, সহজেই তাকে বাজি ধরাতে পারবে। আমি যদি ওকে একশো পাউণ্ড দিতুম তাহলে ও এত খবর আমাকে দিত কি না সন্দেহ! ওই বাজি খেলে এক সভরেন জেতার আনন্দে ও গড়গড় করে সব কথা বলে ফেললে। ... বুঝলে ওয়াটসন, মনে হচ্ছে যে, সমস্যার সমাধান প্রায় হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে, মিসেস ওকশটের সঙ্গে আজ রাত্রেই দেখা করব না কাল সকালে দেখা করব। যতটুকু বুঝতে পারছি আমরা ছাড়াও কোনও-কোনও লোক ঐ হাঁস সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে।"

একটা প্রচণ্ড গোলমালে হোম্‌সের কথা চাপা পড়ে গেল। আমরা যে দোকানটা থেকে একটু আগেই বেরিয়ে এসেছি সেইখান থেকেই গোলমালটা আসছে। ভাল করে নজর করতে দেখলুম যে দোকানের দরজার গোড়ায় একজন ছুঁচোমুখো লোক ভিজে-বেড়ালের মতো জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর ঘুসি বাগিয়ে ব্রেকেনরিজ তার সামনে খুব চোটপাট করছে। ব্রেকেনরিজের গলা শুনতে পেলুম। "তোমরা তোমাদের ওই হাঁস নিয়ে গোল্লায় যাও, জাহান্নামে যাও। আমি তোমাদের কিচ্ছু জানি না। এই শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি, আর যদি ওই হাঁসের কথা আমার কাছে তোলো তো তোমাদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেব। যাও, মিসেস ওকশটকে ডেকে নিয়ে এসো। যা বলবার আমি তাকেই বলব। তোমাকে বলব কেন? আমি কি হাঁসগুলো তোমার কাছ থেকে কিনেছিলুম?"

সেই ভিজে-বেড়াল লোকটি প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাবে বললে, "না না, তা নয়। তবে কিনা ওই হাঁসগুলোর মধ্যে একটা আমার ছিল।"

"সে তুমি মিসেস ওকশটের সঙ্গে বোঝাপড়া করো।"

"মিসেস ওকশটই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।"

"মিসেস ওকশট কেন, প্রুশিয়ার রাজা বললেও ভারী আমার বয়ে গেল। এ নিয়ে আমি ঢের ব্যতিব্যস্ত হয়েছি, আমি বলছি এ-ব্যাপারের কোনও কিছু আমি জানি না। যাও, এখন এখান থেকে ভাগো!" ব্রেকেনরিজ তার দিকে তেড়ে আসতেই লোকটা পিঠটান দিল।

"যাক, শেষ পর্যন্ত ব্রিকস্টন রোড পর্যন্ত যাবার দরকার না-ও হতে পারে। চলো একটু এগিয়ে দেখা যাক ওই লোকটার কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যায় কিনা," হোম্‌স চুপিচুপি আমাকে বললে।

রাস্তায় কিছু বেকার লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে হোম্‌স তাড়াতাড়ি পা চালালে। একটু পরেই হোম্‌স পেছন থেকে তার জামা ধরে আস্তে টানলে। অসম্ভব রকম চমকে গিয়ে ফিরে তাকালে। রাস্তার আলোয় দেখলুম তার মুখ ভয়ে একদম সাদা।

সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনও রকমে বললে, "কে আপনি? কী চান?" (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

রাজপুত্তুর

রাখাল বিশ্বাস

উড়িয়ে বেলুন রঙিন সুতোয়
মিষ্টি সুরে গান সে গায়
রঙের ঘোড়া এক থাপড়ে
টগবগিয়ে সেই চালায়।
উদাস-উদাস চক্ষু মেলে
ভাবত বসে ছন্দ-মিল
আঁধার রাতের সিংদরোজায়
দেয় সে এঁটে আলোর খিল।
মেঘের চুড়োয় উঠতে জানে
হঠাৎ যদি ইচ্ছে হয়
পাখির পালক মাথায় গুঁজে
ভাবটা দেখায় ফাস্টো বয়।
রাজার পোশাক পরেই বলে,
একটি দিনের আমিই রাজা
ক্লাস-পালানো দুষ্টুগুলো
টেরটি পাবে, দেবই সাজা।
এমনি সে এক রাজপুত্তুর
কেউ কি তাকে দেখতে চাও?
যায় না দেখা—মায়ের মুখে
গল্পে তাকে শুনতে পাও।

ছবি : দেবাশিস দেব

ব্যথা উপশমের গুণ তো আপনার হাতে!

মচকানি, পেশীর খিঁচ ধরা, গাঁটের আড়ষ্টতা ও দেহের ব্যথা-বেদনার জন্যে!

আপনার দরদী হাতের পরশ আর আয়োডেক্সের ব্যথা উপশমের শক্তির চমৎকার—আপনার পরিবারজনের দুই-ই দরকার। তাই, আয়োডেক্স সব সময়ে হাতের নাগালেই রাখুন। কারণ, আয়োডেক্সে আছে আয়োডিনের গুণ, যা জখম টিস্যুকে সারিয়ে তোলে, আর আছে মিথাইল স্যালিসিলেট, যা ব্যথা-বেদনার জড়কে নির্মূল করে।

আয়োডেক্স লাগালে দিনে দু'বার, দু'গুণ কাজে চমৎকার

ডাক্তারদের মতে ব্যথা-বেদনা পুরো কমে না! যাওয়া অব্দি, আয়োডেক্স দিনে দু'বার ... এবং কমার পরেও আরো কয়েক দিন [illegible] উপসর্গ মাত্র, বেদনার আসল কারণ [illegible] টিস্যু।

সুতরাং, আপনার প্রিয়জন যখনই মচকানি, পেশীর খিঁচ ধরা, গাঁটের আড়ষ্টতা বা দেহের ব্যথা-বেদনার চোটে কষ্ট পাবেন, তখনই আপনার হাতের পরশে [illegible] লাগান—দিনে দু'বার। আর [illegible] দু'গুণ চটপট সেরে চাঙ্গা হয় আর আপনার দরদী হাতের গুণ গায়।

ELL-1508

SKF এক এসকেএফ উৎপাদন

আয়োডেক্স – ব্যথা উপশমের গুণের শক্তিতে ভরপুর খাস বাম

ভুলের ফসল

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত মার্কিন কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গের একটি শখ ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে রূপকথার গল্প ও পল্লীর গান সংগ্রহ করা। 'এক্স' অক্ষরটি কেমন করে ইংরেজি বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত হল তা নিয়ে লোকমুখে প্রচলিত কিছু মজার গল্প স্যাণ্ডবার্গ তাঁর কলমের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত করে রেখে গেছেন। এই রকমের একটি মজার গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি।

লোকটা ছিল ঝিনুক তুলতে ওস্তাদ। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ঝিনুকের মধ্যে থাকে মুক্তো। ঝিনুক খুলে তার মধ্যে থেকে মুক্তো বার করতে ওর জুড়িদার কেউ ছিল না। ঝিনুক তোলে আর তা থেকে ক্ষিপ্র হাতে মুক্তো বার করে। তারপর সেই মুক্তো বিক্রি করে। এমনি করে দেখতে-দেখতে লোকটা অজস্র ধন-দৌলতের মালিক হয়ে বসল।

দিন যায়। বছর যায়। ওস্তাদের বয়স বাড়ে। বয়সের ভারে এখন আর সে আগের মতো অত চটপট মুক্তো বার করতে পারে না। ফলে ব্যবসায়ে মন্দা আসে। ওস্তাদ চিন্তিত হয়ে পড়ে। সংসার চলবে কী করে? কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। ওস্তাদের একটি ছেলে ছিল। অনেক ভেবে-চিন্তে ওস্তাদ ঠিক করল ছেলেটাকেই এ-কাজে গড়ে-পিটে তৈরি করে নেবে। তাহলে আর কোনো ভাবনা থাকবে না। কিন্তু ভাবলে হবে কী, ছেলেটার একটা মস্ত বড় দোষ ছিল। প্রাণটা তার দরাজ ছিল বটে, কিন্তু মনটা ছিল বড়ই ভুলো। কোনোকিছুই সে মনে রাখতে পারত না। সবই ভুলে যেত। এমন ভুলো মন দুনিয়ায় দেখা যায় না। এমন মানুষকে দিয়ে ব্যবসা চলবে কী করে?

ওস্তাদ দুঃখ করে বলত, "ছেলেটাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি। কিছুই ওর মনে থাকে না। ও ঝিনুক তুলতে পারে বেশ ভালই। কিন্তু হলে হবে কী, তা থেকে মুক্তো বার করে নিতে ও বিলকুল ভুলে যায়। এমনি ভুলো মন ওর।"

ওস্তাদের তাই ভারী দুশ্চিন্তা ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু কী করে

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বড়দের জগতে বড় মাপের লেখক হিসেবে যেমন সমাদৃত, ছোটদের মহলেও ঠিক তেমনি। হাসির সঙ্গে মজা, মজার সঙ্গে রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চের সঙ্গে উৎকণ্ঠা, উৎকণ্ঠার সঙ্গে কল্পবিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে রহস্য, রহস্যের সঙ্গে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সত্যি ভূত মিশিয়ে তিনি এমন সব কাহিনী উপহার দেন ছোটদের জন্য যা কিনা একবার পড়লেই ফুরিয়ে যায় না। চেখে-চেখে পড়তে হয়। একবার এবং বারবার। 'তাতিরাতাচি গামা হগুরাস' মানে যে ঠিক কী, সে-কথা তারাই জানে, যাদের পড়া আছে 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। আর নিধিরাম যে কেমন বন্ধু-ভূত, অথবা নন্দকিশোর নামের ভূতটা যে কীভাবে গুপ্তধন আবিষ্কারের অন্যতম নায়ক হয়ে উঠল সে-সব কথাই বা অন্য কেউ জানবে কী করে, যারা পড়েনি 'গোঁসাইবাগানের ভূত' কিংবা 'হেতমগড়ের গুপ্তধন'? ভৌতিক কীর্তির চূড়ান্ত অবশ্য 'ভুতুড়ে ঘড়ি', যে-ঘড়ির মধ্যে রয়েছে অদ্ভুতুড়ে নানার গলার স্বর, আর ভৌতিক মনে হলেও যে-গল্প কিনা শেষ পর্যন্ত পুরো ভুতুড়ে নয়, অদ্ভুতুড়ে এক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী। কল্পবিজ্ঞানকাহিনী হিসেবে 'বক্সার রতন' যেমন দুর্ধর্ষ, জটপাকানো রহস্য-কাহিনী হিসেবে তেমনি তুলনাহীন 'নৃসিংহ-রহস্য'। আসলে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটা গল্পই অন্যরকম। তাই একটাও না-পড়লে চলে না।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোরসাহিত্যসম্ভার : মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০ গোঁসাইবাগানের ভূত ১০·০০ হেতমগড়ের গুপ্তধন ৮·০০ নৃসিংহরহস্য ১০·০০ ভুতুড়ে ঘড়ি ১০·০০ বক্সার রতন ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যে ওকে শোধরাবে ভেবে পায় না। যাই হোক, তবুও ছেলেকে এ-কাজে শিখিয়ে-পড়িয়ে তো নিতেই হবে। পারিবারিক ব্যবসাটা তো আর নষ্ট হতে দিতে পারে না। ওস্তাদ হাল ছাড়ল না। ছেলেকে তালিম দিতে লাগল পুরোদমে। ছেলে কিন্তু দোষটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ফলে ব্যবসার লোকসানটাও কমছে না। ওস্তাদ খুবই বিষণ্ণ মনে দিন কাটায়।

ওস্তাদের বাড়ি থেকে কয়েকটা পাড়া পেরিয়ে গেলেই ছোট্ট মেয়েটির বাড়ি। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি মাথার দুপাশে দুটি সুন্দর ছোট্ট বেণী ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বেণীদুটি অমন সুন্দর হলে হবে কী, মনটি তার ওই একই দোষের দোসর। সেও কিছুই মনে রাখতে পারত না, সবই ভুলে যেত।

মাংসের দোকান থেকে শুরুয়ার মাংস কিনে নিয়ে আসা ছিল মেয়েটির নিত্য কাজ। নিত্যই সে দৌড়ে যেত মাংসের দোকান পর্যন্ত, কিন্তু নিত্যই ভুলে যেত আসল কাজটাই। রোজই ফিরে আসত খালি হাতে, মাংস না নিয়েই। এমন মেয়েকে নিয়ে তো মা-বাবার হল মহা বিপদ। এ-মেয়ে সংসারের কোন্ কাজে লাগবে? যাই হোক, দিন তো আর কারও জন্যে বসে থাকে না। দিন কেটে যায়।

একদিন কে যেন মেয়েটিকে একটা তুক্ শিখিয়ে দিল। হাতের পাশাপাশি দুটো আঙুল একটার ওপর আর একটা আড়াআড়িভাবে একটু হেলানো ক্রুশচিহ্নের মতো করে রাখলে আর কোনো কথা ভুল হয় না। সেই থেকেই সে মাংসের দোকানে যাওয়ার সময় সরল বিশ্বাসে হাতের দুটি আঙুল আড়াআড়ি করে একটার ওপর আর একটা রাখত। আর আশ্চর্য, দোকানে গিয়েই তার মনে পড়ে যেত মাংস নেওয়ার কথা। এর পর থেকে আর কোনোদিন তার মাংস আনতে ভুল হয়নি। এমনিভাবে সংসারের অন্য কাজও সে অবলীলায় করতে লাগল। কোনো কাজেই আর তার ভুল হয় না।

সেদিনও মেয়েটি রোজকার মতোই দৌড়ে যাচ্ছিল মাংসের দোকানের দিকে। পথে ওর খেলার সঙ্গীরা কত ডাকল খেলবার জন্যে। ও কিন্তু কারুর কথাতেই কান দিল না। বলল, "দেখছ না, হাতের আঙুলের দিকে? খেলব কী করে?" সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, "কেন রে,আঙুল দুটো অমন করে রেখেছিস কেন?"

মেয়েটি উত্তর দিল, "শুরুয়ার মাংস আনতে যাচ্ছি যে।" বলেই দিল ছুট। সঙ্গীরা কিছুই বুঝল না, মাংস আনার সঙ্গে আঙুলের কী সম্পর্ক। ওরা অবাক হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

মেয়েটি ছুটে চলল। ছুটতে ছুটতে আচমকা ওর ধাক্কা লাগল ওস্তাদের ছেলের সঙ্গে। দুজনে রাস্তার দু'পাশে ছিটকে পড়ল।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠল, "দেখে চলতে পারো না? যাচ্ছিলে কোথায় অমন উটমুখোর মতো?"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ছেলেটি উত্তর দিল, "তাই তো, কোথায় যাচ্ছিলুম? মনে করতে পারছি না তো! একটা কোনো কাজে নিশ্চয়ই যাচ্ছিলুম। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভেবে দেখছি। কই না তো, মনে পড়ছে না কিছুতেই।"

মেয়েটি হো-হো করে হেসে উঠল। "ও হরি, তোমারও বুঝি আমার মতোই দশা! কিছুই মনে থাকে না? তা এসো, একটা জাদু তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। দেখবে আর কোনোদিন কিচ্ছু ভুল হবে না। এই দ্যাখো, আঙুলদুটো এমনি করে একটার ওপর আর একটা রাখো, ঠিক এমনি করে ক্রুশচিহ্নের মতো।.... হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। জানো, জাদুটা শেখাবার পর থেকে আর আমার কিচ্ছু ভুল হয় না। সব মনে থাকে।"

ছেলেটি চোখদুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে বলল, "সত্যি?"

মেয়েটি হেসে বেণী দুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ গো, এই দ্যাখো না, আমি রোজ কেমন শুরুয়ার মাংস কিনে নিয়ে আসি, একদিনও কি ভুল হয়? আগে তো আমি রোজই ভুলে যেতুম তোমার মতোই। কী বকুনিটাই না খেতুম এজন্যে!"

ছেলেটি দেখল এ তো বেশ মজার তুক্। সেই থেকে সেও এটি অভ্যাস করল। সত্যিই এখন তার সব কথাই মনে থাকে, কিছুই আর ভুল হয় না।

মুক্তো বার করতে এখন আর তার ভুল তো হয়ই না, বরং সে বালতি-বালতি মুক্তো বার করে বাবার হাতে এনে দেয়। যেমনি চটপট সে ঝিনুক তোলে তেমনি চটপট ঝিনুক খুলে তা থেকে মুক্তো বার করে বালতি ভরে ফেলে নিমেষে।

ওস্তাদ আশ্চর্য হয়ে যায়।

আনন্দে আটখানা হয়ে গিন্নিকে বলে, "দ্যাখো, দ্যাখো, তোমার ভুলো ছেলের কাণ্ড দ্যাখো।"

গিন্নির মুখ হাসিতে ভরে ওঠে।

"কী করে পারছিস বাবা?" ওস্তাদ জানতে চায়।

ছেলেটি হাতের আঙুল দুটো দেখায়। তারপর বাবাকে সব কথাই বলে। কেমন করে মেয়েটির কাছ থেকে এই তুক্ শিখেছে সব খুলে বলে।

তুকের শক্তি দেখে ওস্তাদের তাক লেগে যায়।

ওস্তাদের দুঃখ ঘুচল। ভাবল এমন একটা অদ্ভুত জাদুর কথা দেশের পণ্ডিতদের জানানো উচিত।

পণ্ডিতদের কাছে গিয়ে সব কথা বলল ওস্তাদ।

পণ্ডিতেরা সব শুনে চমৎকৃত হলেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁরা ঠিক করলেন এমন একটা বিস্ময়কর জাদুকে বিস্মৃত হতে দেওয়া চলবে না। একে স্মরণীয় করে রাখতেই হবে। তারপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তাঁরা স্থির করলেন, আঙুল দুটি আড়াআড়ি করে রাখার ফলেই যখন এতবড় অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে, তখন ঠিক সেই আকারেরই একটি অক্ষর সৃষ্টি করে যদি ইংরেজি বর্ণমালায় তার ঠাঁই করে দেওয়া যায় তাহলে জাদুটির কথা কেউ কোনোদিন আর ভুলবে না, আর আমাদের নিত্যকার জীবনের সঙ্গে এই জাদুটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে উঠবে।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ।

সৃষ্টি হল ইংরেজি 'এক্স' (X) অক্ষরটি।

এমনি করে সেই ছোট্ট মেয়েটি আর সেই ছোট্ট ছেলেটির দৌলতে নতুন একটা অক্ষর যুক্ত হল ইংরেজি বর্ণমালায়।

তারপর একদিন ওদের এই অক্ষয় অবদান স্মরণে মহা ধুমধাম করে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

ওরা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

ছবি : দেবাশিস দেব

কাছে, আরো কাছে পেতে—ক্লোজ-আপ

এই অলস, কুয়াশাঘেরা, পাগল করা গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা...হাসিখেলা ভাগ ক'রে নিয়ে, মুখর, গুঞ্জনে ভরা বেলা—আর এই মিলন-খেলায় মেতে উঠতে আপনার মধ্যে আছে ভরপুর আত্মবিশ্বাস.—ক্লোজ-আপের আত্মবিশ্বাস !

স্বচ্ছ লাল ক্লোজ-আপের অতি সাদা করার দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় সবচেয়ে সাদা আর এর বিশেষ মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় সবচেয়ে তাজা !

তাই ক্লোজ-আপের হাসি হাসুন আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাছে, আরো কাছে আসুন—কারণ, ক্লোজ-আপ যে শুধু কাছে, আরো কাছে পাওয়ার জন্যেই !

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS CX 592619 BG

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

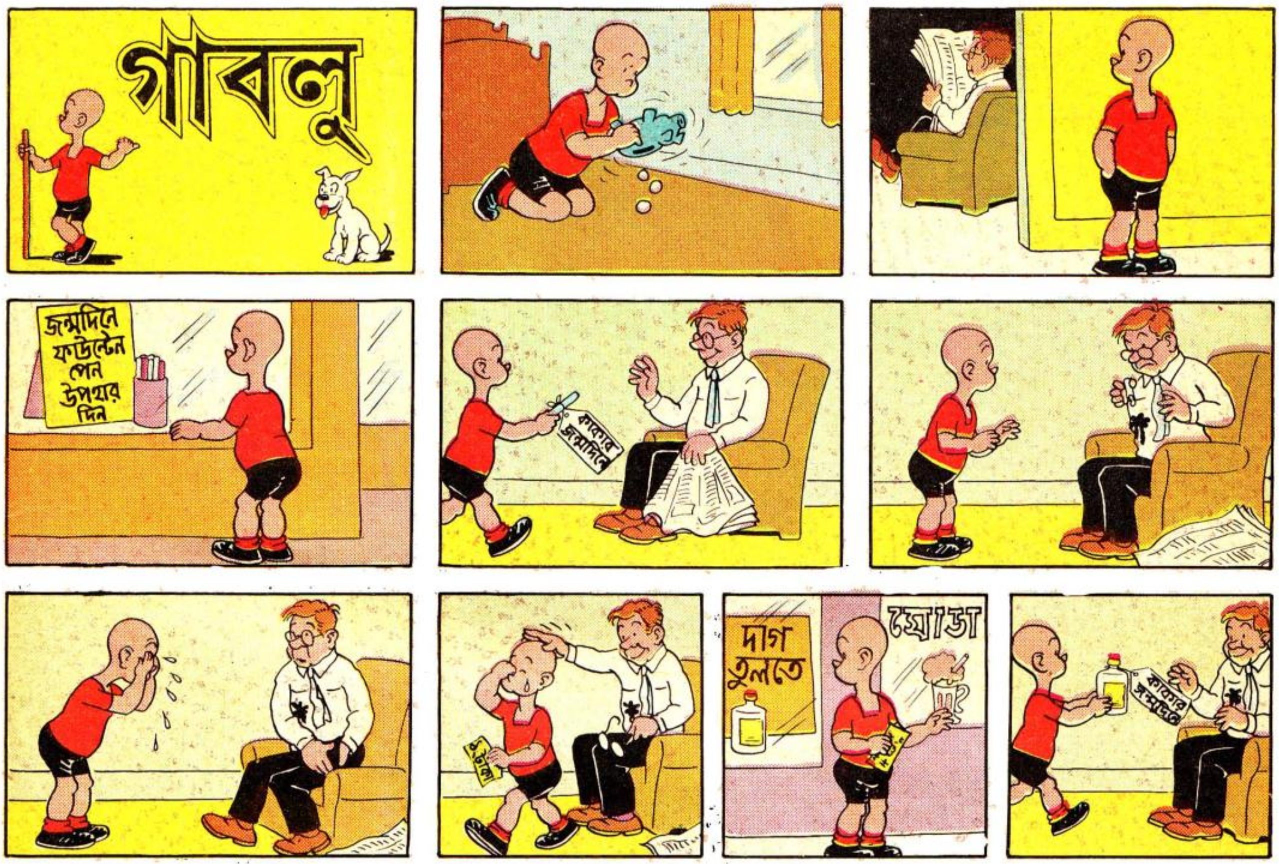

গাবলু
জন্মদিনে ফাউন্টেন পেন উপহার দিন
কাকার জন্মদিনে
দাগ তুলতে

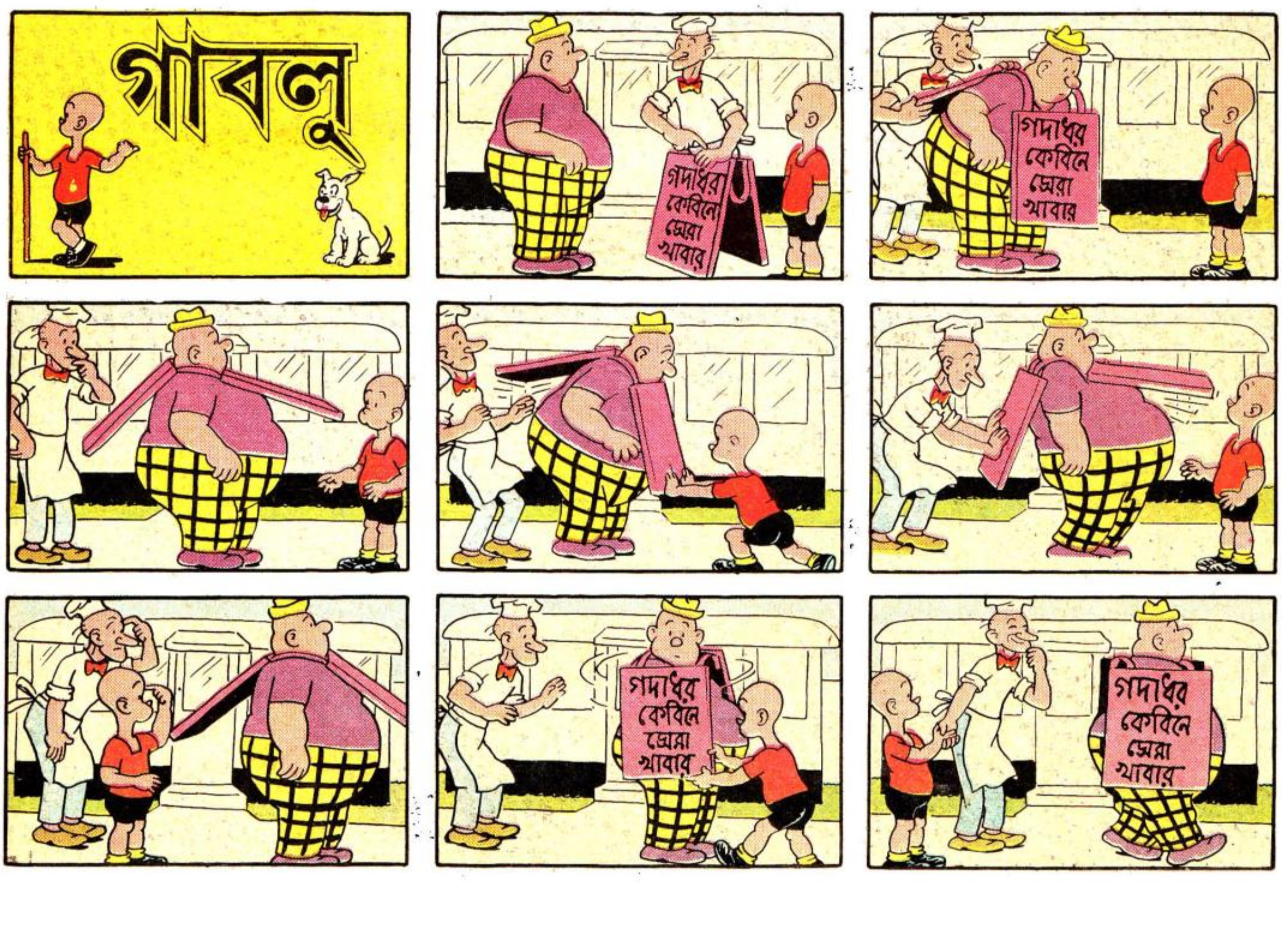

গাবলু
গদাধর কেবিনে সেরা খাবার

বার্ধক্যের বারাণসী

রাজা গুপ্ত

জাতীয় ফুটবলে পঞ্জাব বিজয়ী হল। কিন্তু আমাদের কাছে তার চেয়েও বড় খবর, বাংলা কোয়ার্টার্র ফাইনালেই হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে।

বারাণসীতে কোয়ার্টার্র ফাইনাল লিগ শুরু হয়েছিল আটটি টিমের মধ্যে। 'এ' গ্রুপে ছিল বাংলা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও হিমাচল প্রদেশ। প্রথম ম্যাচে বাংলা মুখোমুখি হয়েছিল শক্তিশালী পঞ্জাবের। সম্মানের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পঞ্জাব জিতল ২—১ গোলে। গত মরসুমের সবচেয়ে দামি ফুটবলার লিঙ্কম্যান প্রশান্ত ব্যানার্জির বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তা বাংলার মাঝমাঠকে কার্যত অকেজো করে তোলে। আর ফরোয়ার্ড লাইনের কথা যত কম বলা যায়, তত ভাল। সুবীর, কার্তিক, দেবাশিস, প্রণব এই খেলার 'ভিডিও' দেখলে রিটায়ারমেণ্টের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, গোল-মিসের লজ্জায়। অথচ ৫৭ মিনিট পর্যন্ত বাংলা এক গোলে এগিয়ে ছিল! পঞ্জাবের অধিনায়ক কাশ্মিরা সিং ডান ও বাঁ দিক

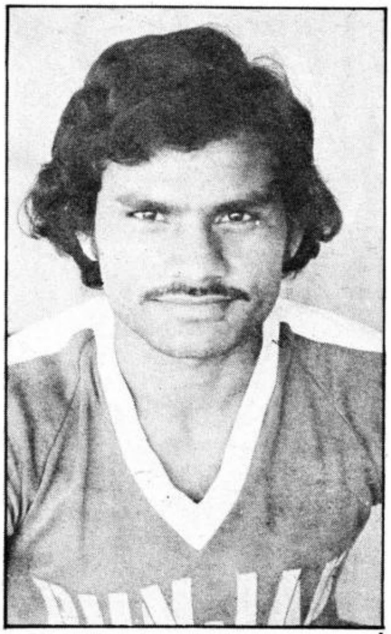

কাশ্মিরা সিং

থেকে পাঠানো দুটি সেণ্টার ধরে পরপর দুটি গোল করে গেলেন ডিপ-ডিফেন্সকে দাঁড় করিয়ে। গ্রুপের অন্য খেলায় মহারাষ্ট্র ৪—০ গোলে হারায় হিমাচল প্রদেশকে।

পরের ম্যাচে ছ' গোলে না জিতলে বাংলার সেমি-ফাইনালে ওঠা সম্ভব হত না। বাংলা জিতল। এবং জিতল হিমাচল প্রদেশের ভুল স্ট্র্যাটেজির ফলে। আট-নয়জনকে ডিফেন্সে দাঁড় করিয়ে তারা না পারল বাংলার ফরোয়ার্ডদের পা থেকে বল ছিনিয়ে নিতে, না পারল পাল্টা আক্রমণ গড়ে তুলতে। বলতে গেলে একরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হেরে গেল হিমাচল প্রদেশ। ওদিকে ১—০ গোলে পঞ্জাবকে হারিয়ে অঘটন ঘটাল মহারাষ্ট্র। সুতরাং শেষ ম্যাচে মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে বাংলার সরাসরি জয়ের দরকার ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ১—০ গোলে হেরে একুশবারের চ্যাম্পিয়ান বাংলা সন্তোষ ট্রফি থেকে বিদায় নিল। একচল্লিশ বারের প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার্র ফাইনালে বাংলার বিদায় এই প্রথম ঘটল। এই ম্যাচেও ফরোয়ার্ডদের গোলমুখে ব্যর্থতা চোখে পড়েছে।

এই প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই বোঝা গিয়েছিল বাংলার ফুটবল বার্ধক্যে পৌঁছেছে। বার্ধক্যের পক্ষে বারাণসীই আদর্শস্থান। সুতরাং বাংলার ফুটবলের সুনাম ডোবানোর জন্য ফুটবলাররা বেছে নিলেন বারাণসীর গঙ্গা।

'দলবদলের কথা মাথায় রেখে বাংলার নামী ফুটবলাররা পা বাঁচিয়ে খেলেছে', এই অভিযোগ এনেছেন দলের কোচ স্বয়ং। একটা সময় বাংলার হয়ে ফুটবল খেলাটা ছিল ফুটবলারদের কাছে স্বপ্নের, গর্বের। আজ বাংলার ফুটবলের সম্মানরক্ষার ব্যাপারটা হয়ে গেছে নিতান্তই গৌণ। বাঙালি বড় আবেগপ্রবণ জাত। জাতীয় ফুটবল থেকে অসম্মানজনকভাবে বাংলার বিদায়ে আমরা নিশ্চিতভাবেই কিছুদিন এইসব ফুটবলারদের ওপর ক্রোধ এবং অসন্তোষ প্রকাশ করব। তারপর ময়দানের ছেলেমানুষি ফুটবল এসে গেলেই সব কিছু ভুলে 'তারকা' ছাপ-মারা প্লেয়ারদের নিয়ে মাতামাতি করব। ভুলে যাব, এই সব 'স্টার' ফুটবলাররাই মাত্র কয়েকটা দিন আগে বাংলার ফুটবলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেছেন অবহেলায়। আমরা দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছি, এই চরম সত্যিটাও কি তাঁদের প্রতি আমাদের অকারণ মোহের অবসান ঘটাবে না কোনওদিন?

ভারত, আবার

রথম্যান্'স ট্রফিও ভারতই জিতল। শারজায় মোট চারটি দেশকে নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল এক-দিনের ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার। তাতে এই জয়ের ফলে নতুন করে প্রমাণিত হল যে, এক-দিনের ক্রিকেটে ভারতই এখন সেরা দল। আগামী সংখ্যায় এই জয়ের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

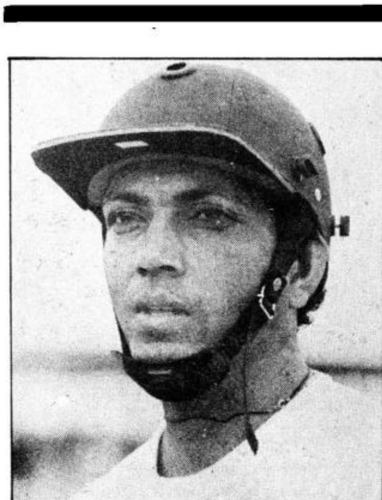

মহিন্দর (ফাইনালে ম্যান অফ দি ম্যাচ)

দাত্তুর উইকেট পড়ে গেল

সম্রাট রায়

১৯৫৮-৫৯ সিরিজে ইডেনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দেখেছিলাম দাত্তু ফাড়কারকে। তখন বয়স তাঁর শরীরে ছায়া ফেলেছে। ব্যাটসম্যানকে বিপন্ন করার মতো নিয়ন্ত্রণ বা গতি বলে ছিল না। তবে মনে আছে, ফলো-অনের পরে গিলক্রিস্ট ও হল নামক দুটি দৈত্যের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে মঞ্জরেকার ও ফাড়কারের রুখে দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গিটি। ইডেনে ভারতের বৃহত্তম পরাজয়ের মধ্যেও ফাড়কারের সংগ্রামী ইনিংসটি মন ছুঁয়েছিল। টেস্ট ক্রিকেটে ওটাই ছিল তাঁর শেষ ইনিংস।

সংগ্রামী মানুষরা চিরকালই জয়যুক্ত হন। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে অস্তিত্ব বাঁচানোর প্রাণান্তকর চেষ্টায় পাশাপাশি টেস্ট ক্রিকেটার হবার স্বপ্ন দেখতেন ফাড়কার। ১৯৪৭-৪৮ সিরিজে ভারতের হয়ে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। এবং ব্রাডম্যান-সমৃদ্ধ দলের বিপক্ষে। ওই সময়ের অস্ট্রেলিয়াকে বলা হয় 'সর্বকালের সেরা টেস্ট সাইড'। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের প্রত্যেকটি বিভাগ চাবুক। সেই দলের বিরুদ্ধে এবং ক্রিকেট-ইতিহাসের সর্বোত্তম পেস-জুটি হিসেবে চিহ্নিত লিণ্ডওয়াল-মিলারের ভয়ঙ্কর ঝাপ্টা সামলে ফাড়কার জীবনের প্রথম সিরিজেই একটি ঝক্‌ঝকে সেঞ্চুরিসহ রান করেছিলেন ৩১৪। আর পেয়েছিলেন আটটি উইকেট, যার মধ্যে ছিল স্যার ডনের মতো ক্রিকেটারের নামও। বাইশ বছরের তরুণের পক্ষে স্বপ্নময় সূচনাই বলা যায়। সিরিজ শেষে স্যার ডন বলেছিলেন, "সফরের শেষ দিকে প্রচুর উন্নতি করেছিলেন ফাড়কার। মধ্যম গতির হলেও তাঁর কন্ট্রোল এবং চেঞ্জ অব পেস ছিল সমীহ করার মতো। স্টাইলের দিক দিয়ে তেমন চিত্তাকর্ষক না হলেও খেলতেন সোজা ব্যাটে, সাহসের সঙ্গে।" ওই সিরিজেই প্রমাণিত হয়েছিল আগামী বেশ কিছুদিন ভারতের ব্যাটিং এবং বোলিং এই অলরাউণ্ডারের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

১৯৪৮-৪৯ সিরিজে দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত প্রথম জয়টি পেতে পারত বোম্বাইতে। ৩৬০ রান করলে জিত, এই অবস্থায় ব্যাট করতে নেমে ভারত প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ৮ উইকেটে ৩৫৫ রানে পৌঁছতেই আম্পায়ার যোশি শেষ হবার দেড় মিনিট আগেই খেলা বন্ধ করে দেওয়ায় ভারত মাত্র ছ'রানের অভাবে জয় পায়নি। জয় সম্পর্কে শতকরা একশোভাগ নিশ্চিত ছিল ভারত, কারণ উইকেটে ৩৭ রানে অপরাজিত ব্যাটসম্যানটি ছিলেন ফাড়কার। সিরিজে ২৪০ রান এবং ১৪টি উইকেট-প্রাপ্তিই বলে দেবে দাত্তু কেমন ফর্মে ছিলেন।

১৯৫১-৫২ সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইডেনে ১১৫ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন ফাড়কার। সেই থেকেই বাংলার সঙ্গে নিবিড় সখ্য জন্মে গিয়েছিল কোলাপুরের এই মানুষটির। সম্ভবত সেই কারণেই কলকাতায় বেঁধেছিলেন স্থায়ী আস্তানা। বাংলার হয়ে খেলেছেন রঞ্জি ট্রফিতে (জাতীয় ক্রিকেটে চার রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ফাড়কার)। রঞ্জিতে সেরা বোলিংও (৩৭ রানে ৭ উইকেট) বাংলার হয়ে বিহারের বিপক্ষে। জীবনে ৩১টি টেস্টে দুটি সেঞ্চুরিসমেত (সর্বোচ্চ ১২৩) ১২২৯ রান এবং ৬২টি উইকেট পেয়েছিলেন ফাড়কার। তখনকার দিনে এত ঘন ঘন টেস্ট খেলা হত না। হলে তাঁর ক্রিকেট পরিসংখ্যানের আকার যে আরও ফুলে উঠত, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কপিলদেবের আগে ভারতের এক ও দুই নম্বর অলরাউণ্ডার বলতে ভিনু মাঁকড় আর দাত্তু ফাড়কারকেই বোঝাত।

শক্ত নামের, সহজ মনের মানুষ দত্তাত্রেয় গজানন ফাড়কার চলে গেলেন জীবনের ইনিংস শেষ করে।

অলউইন। এমন এক
জিনিষ যা নিজে ভোগ ক'রে
বা উপহার দিয়ে গৌরব
বোধ করবেন!
অলউইন
ঘড়ি
Manufactured under licence from
SEIKO
৩ বছরের
গ্যারাণ্টী
ALLWYN
SAA/HAL/2528/BN

খেলার খবর তো গত সংখ্যাতেই পেয়েছ । এবারে উপহার নাও
'চ্যাম্পিয়ান অব চ্যাম্পিয়ানস' রবি শাস্ত্রীর রঙিন ছবি

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

ডেভিস কাপে ভারত

সুজয় সোম

ডোয়াইট ডেভিস তখন হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আঠারোশো নিরানব্বুই সাল, আমেরিকার টেনিসে একচ্ছত্র অধিপতি ! খেলাটাকে গোটা পৃথিবীতে জনপ্রিয় করতে চাইলেন । উনিশশো সালের ষোলোই জানুয়ারি আমেরিকান লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনকে দিলেন সাতশো ডলার দামের, সোনার হালকা আস্তরণে মোড়া, চমৎকার কারুকাজের রুপোর ডেভিস কাপ । দুশো সতেরো আউন্স ওজন । উচ্চতা তেরো ইঞ্চি, ব্যাস আঠারো ইঞ্চি । বস্টনের লংউড মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল আটই আগস্ট । ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার লড়াই । ৩-০ ম্যাচে জিতে গেলেন ডেভিসসায়েবরা ।

বারে বারে বদলানো হল প্রতিযোগিতার কাঠামো । সময়ের সঙ্গে তাল রেখে । তাই ডেভিস কাপের চরিত্র, মেজাজ সব সময়েই আধুনিক । মেতে উঠল সারা বিশ্বের একের পর এক দেশ । ক্রমেই বেড়ে গেল এই আসরের আকর্ষণ, গুরুত্ব, গ্ল্যামার, মর্যাদা । তবে সেকালে লড়াইটা ছিল নিছকই 'ফ্রেণ্ডলি' । ষাটের দশক পর্যন্ত খেলোয়াড়রা পেশাদারও ছিলেন না । এমনকী আর কোনও-কোনও খেলাতেও তাঁদের বেজায় ঝোঁক, পারদর্শিতা !

ভারতীয়রা ডেভিস কাপে প্রথম খেললেন উনিশশো একুশ সালে । ফ্রান্সকে ৪-১ ম্যাচে হারিয়ে, সেমিফাইনালে জাপানের কাছে বেমালুম ৫-০ ! বাইশ সালেও রুমানিয়ার সঙ্গে ৫-০ ম্যাচে জিতে, স্পেনের বিরুদ্ধে ১-৪ ! চৌত্রিশ বছরের ইতিহাস খুঁটিয়ে জানতে চেয়ো না । মনখারাপ হবে । শুধু ছেষট্টি ও চুয়াত্তর সালে ফাইনালে উঠতে পেরেছিলাম আমরা । সেই সুসমাচারটুকু ডিটেলে বলি ।

ছেষট্টিতে ইন্টার-জোন ফাইনালের লড়াই হল কলকাতায়, ব্রাজিলের সঙ্গে । টমাস কোকের সার্ভিস, রিটার্ন, ভলির দাপটে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় হেরে গেলেন । ৬-২, ৬-২, ৬-৩ ! জোসি ম্যানডারিনোর বিরুদ্ধে অসাধারণ পাসিং শট, ড্রপ ভলির দৌলতে ৫-৭, ৬-২, ৬-৩, ৬-২ গেমে জিতলেন রামনাথ কৃষ্ণন । ডাবলসে টমাস-জোসিকে তাচ্ছিল্য করে কৃষ্ণন-জয়দীপ জিতে গেলেন ৭-৫, ৩-৬, ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩ গেমে । জোসি-জয়দীপের সিঙ্গলসে (৯-৭, ৩-৬, ৬-৪, ৩-৬, ৭-৫) কব্জির কারসাজিতে মারা ড্রপ ভলি, চোখ-ধাঁধানো পাসিং শট, লবিংয়ের প্রদর্শনী ! চাবুকের মতো ব্যাকহ্যাণ্ডের আড়াআড়ি ক্রসকোর্ট ড্রাইভে রামনাথ টমাসকে হারালেন ৩-৬, ৬-৪, ১০-১২, ৭-৫, ৬-২ গেমে ।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি, মেলবোর্নে । ফ্রেড স্টোলে কৃষ্ণনকে (৬-৩, ৬-২, ৬-৪), রয় এমারসনের সামনে জয়দীপও (৭-৫, ৬-৪, ৬-২) চুপসে গেলেন । কিন্তু টনি রোচ ও জন নিউকোম্বকে নাকানি-চোবানি খাওয়ালেন কৃষ্ণন -জয়দীপ : ৪-৬, ৭-৫, ৬-৪, ৬-৪ ! সার্ভিস ও ড্রপ শট মারার দুর্বলতার সুযোগে রামনাথকে ৬-০, ৬-২, ১০-৮ গেমে হারালেন এমারসন । ডেভিস কাপ ফসকে গেল । নিয়মরক্ষার খেলায় ফ্রেড জয়দীপকে হারাতে নাজেহাল ! চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডেই নাম বদলে হল ডেভিস কাপ ফাইনাল, বাহাত্তর সালে ।

বিজয় অমৃতরাজ (ভারতের বড় ভরসা)

চুয়াত্তরে ফের কলকাতায় পূর্বাঞ্চল ফাইন্যাল, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে । যশজিৎ সিং ও বব গিলটিনান ডিপ প্লেসিংয়ে বা ড্রপ, ভলির কেরামতিতে পালা করে এগোলেন । ১১-৯, ৯—১১, ১২-১০, ৮-৬ গেমে জেতার আনন্দ উবে গেল বিজয় অমৃতরাজ ১২-১৪, ১৫-১৭, ৮-৬, ২-৬ গেমে হেরে যেতেই । জন আলেকজাণ্ডারের বলকে বাঁক খাওয়ানোর দারুণ ক্ষমতা ! ডাবলসে কলিন ডিবলি ও জনকে হারালেন বিজয়-আনন্দ অমৃতরাজ—দুর্দান্ত সার্ভিস, রিটার্ন, লব, ভলি, স্ম্যাশ, নেট প্লেসিং ! ১৭-১৫, ৬-৮, ৬-৩, ১৬-১৮, ৬-৪ । যশজিৎ এঁটে উঠতে পারলেন না জনের সঙ্গে : ৬-৮, ৪-৬, ৩-৬ । শেষ ম্যাচে বিজয় জিতলেন ৬-১, ৫-৭, ৬-৪, ৬-৪ গেমে । তাঁর ব্যাক ও ফোরহ্যাণ্ডের অ্যাঙ্গল শট, ড্রপ, ডাউন দ্য লাইন বা পাসিং শট দেখে ববও মুগ্ধ !

পুনের সেমিফাইনালে বিজয়ের কাছে রাশিয়ার তৈমুরাজ কাকুলিয়া স্ট্রেট সেটেই কাবু ! ৬-৪, ১১-৯, ৬-৩ । আলেকজাণ্ডার মেট্রিভেলির ফোরহ্যাণ্ড ও গ্রাউণ্ড স্ট্রোকের চাতুরিতে মুখ গোমড়া করে কোর্ট ছাড়লেন আনন্দ । ৬-৪, ৯-৭, ৬-৩ । দু-দিনে দুশো সাতান্ন মিনিটের ডাবলসে মেট্রিভেলির কোর্ট ক্র্যাফ্‌ট, মারের টাইমিং, ব্যাকহ্যাণ্ড ভলি কিম্বা ভ্লাদিমির করোতকোভের টপ স্পিন মেশানো সার্ভিস ছাপিয়ে অমৃতরাজ ভাইদের সাফল্য : ১৩-১৫, ৭-৫, ১৯-১৭, ৬-৩ । ফিরতি সিঙ্গলসেও বাহারি স্ট্রোকে আনন্দ ৬-২, ৮-১০, ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩ গেমে তৈমুরাজকে হারালেন । বিজয়-আলেকজাণ্ডারের লড়াই শেষ হল না । বর্ণবৈষম্য-বিরোধী অগ্রণী দেশ হিসেবে ভারত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা বয়কট করল ।

কলকাতার সাউথ ক্লাবের কোর্টে ডেভিস কাপের তৃতীয় আসরেও ইতালিকে ৩-২ ম্যাচে হারিয়ে উনিশশো পঁচাশির টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল । ছেষট্টি বা চুয়াত্তর সালের জের টেনে পঁচাশিতেও ফাইনালে উঠে, শেষ পর্যন্ত···স্বপ্ন তো সত্যিও হয় কখনও-কখনও ।

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন **সানলাইট**

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রত্যেকটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

ANANDAMELA 17 APRIL, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

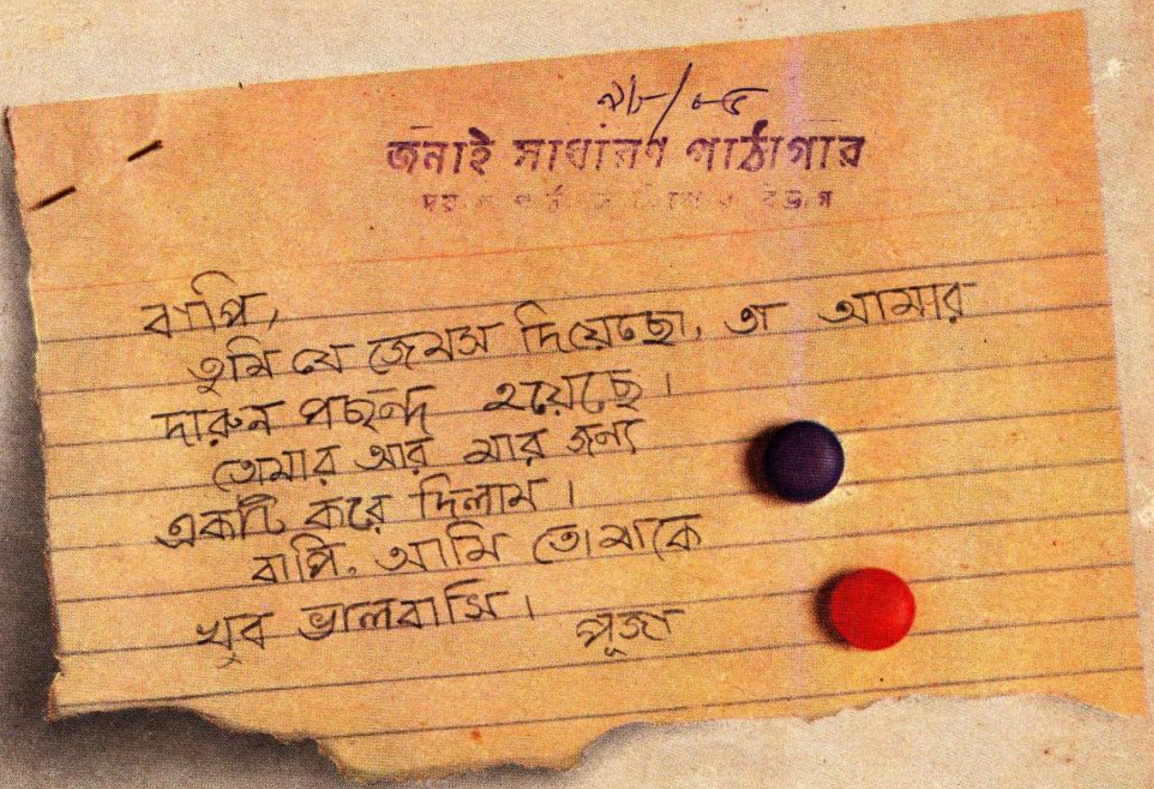

আজ যখন তুমি জেম্‌স আনবে ঘরে
দেখবে কি মজায় মন উঠবে ভরে
ছোটখাটো দেখতে চকলেটে ঠাসা
খেলতে আর খেতে পাবে মজা খাসা

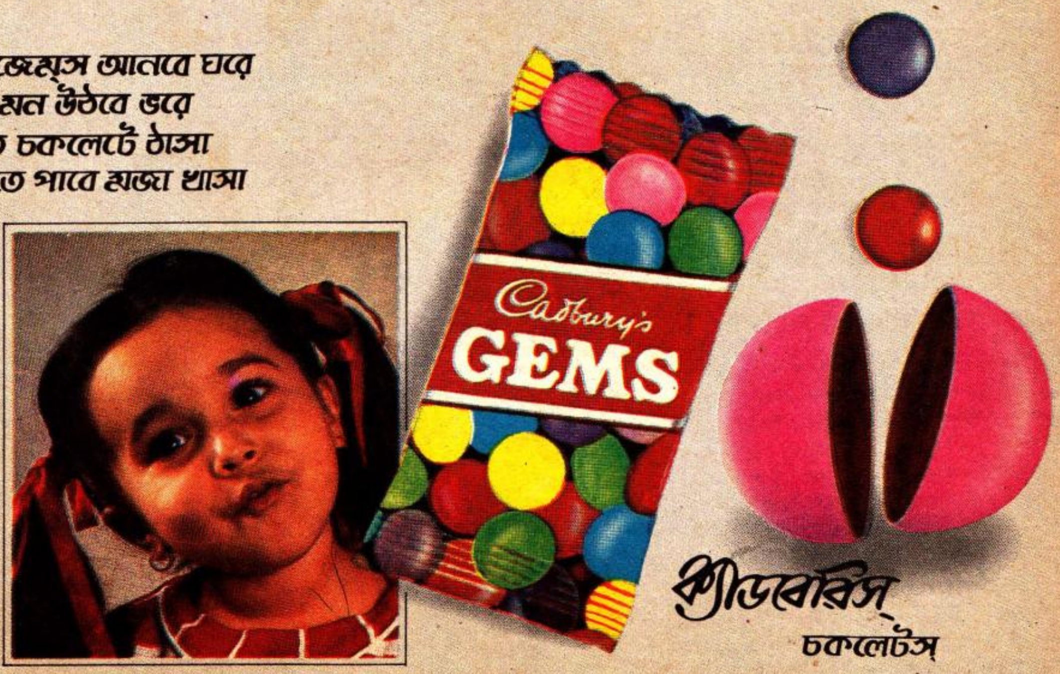

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্